গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল

(প্রাক্-মধ্য যুগ)

রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল

(প্রাক্-মধ্য যুগ)

রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৯৯

উৎসর্গিত

আমার মা শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
ও বাবা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়কে

প্রাক্-কথন

কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সূচনা করেছেন 'গৌড়-জনের' উল্লেখ দিয়ে, যাঁদের 'নিরবধি সুধাপানের' উদ্দেশ্যে এই কাব্য-রূপ 'মধুচক্র' রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন, এখানে 'গৌড়জন' বলতে বাঙ্গালী মাত্রকেই বোঝায়। আবার, শ্রীমৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গৌড়ের নিকট রামকেলিতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সে গৌড় মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী ছিল, তার অবস্থান বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে মালদহের নিকট। আদিমধ্যযুগে সেনবংশীয় শাসকেরা 'গৌড়েশ্বর' নামে খ্যাত। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে গঙ্গাতীরে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী তাঁর অন্যতম রাজধানী ছিল। গঙ্গার কোন তীরে? সপ্তদশ-শতক পূর্বে বাংলায় গৌড় ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। কিন্তু পরবর্তীকালের মানচিত্র অনুসারে গৌড়ের দক্ষিণে ভাগীরথী ও গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত। কারও কারও মতে মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে প্রাচীন গৌড় অবস্থিত (অক্ষাংশ ২৪°৫২' উত্তর, দ্রাঘিমা ৮৮°১০' পূর্ব)। যাই হোক, 'গৌড়' নামটি যেমন সমগ্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি তার দ্বারা একটি নগর-রাজধানীও সূচিত হয়।

গৌড় নামে যেমন নগরী ছিল, গৌড় নামে একটি 'জনে'র দ্বারা অধ্যুষিত জনপদ বা দেশও ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখ থেকে সমুদ্র-আশ্রিত গৌড়-গণের কথা জানা যায়। কিন্তু সেই গৌড়দের দ্বারা অধ্যুষিত জনপদটির অবস্থান কি ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে? বানভট্টের 'হর্ষচরিত্র' এবং হিউ-এন-সাঙের বিবরণ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর যে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কথা জানা যায়, তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়)। অতএব, মনে হয়, তিনি ছিলেন গৌড়-জনপদের অধিপতি। সেক্ষেত্রে সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরে গঙ্গার তীর পর্যন্ত গৌড়-জনপদ হয়ত বিস্তৃত ছিল। অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল বংশের শাসকদের 'গৌড়েশ্বর' ও 'বঙ্গপতি' উপাধি সমার্থক ছিল। কাজেই, বাংলার বাইরে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতেও গৌড় দেশের অবস্থিতির কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেলেও, এমন কি দক্ষিন-ব্রহ্মের পেগুশহরের নিকটবর্তী এক গৌড়ের সংবাদ পাওয়া গেলেও, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যগত ও লৈখিক প্রমাণের ভিত্তিতে গঙ্গা-তীর (উত্তর বা পশ্চিম) থেকে সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে গৌড়-দেশ বা জনপদ বলে চিহ্নিত করা যায়।

অবশ্য, কখনও কখনও গৌড়-জনপদ দিগ্বিজয়ী শাসকদের অধীনে গৌড়-সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। গৌড়-সাম্রাজ্য না বলে গৌড়-রাষ্ট্র বললেও কোনও ক্ষতি হয় না। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'র ট্র্যাডিশান অনুসারে সেই রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটেছিল বঙ্গদেশ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। আবার, 'স্কন্দপুরাণে' উল্লেখিত পঞ্চগৌড় অর্থাৎ সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়, বিস্তৃততম গৌড়-রাষ্ট্রের পরিচয় দেয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে নয়, সংস্কৃতির বিচারে গৌড়ীয় প্রভাব এক সময়ে সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' ও রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় "গৌড়ী" প্রাকৃত ভাষার একটি নির্দিষ্ট রূপ। আবার, গৌড় সারঙ্গ, গৌড়ী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর নাম থেকে অনুমান করা যায় গৌড়ের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা। গৌড়ী-লিপি স্বীকৃতি লাভ করেছিল পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতে। ধীমান ও বীতপাল গৌড়ী শিল্প-রীতির প্রবর্তক ছিলেন। মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম উত্তরভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। কাজেই, গৌড় যেমন ছিল রাজনীতির, তেমনই সংস্কৃতির কেন্দ্র, প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ঐতিহাসিক ভূগোল রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উৎস ও ক্রমবিকাশের হদিস দেয়। কারণ, জন-জাতি ও জনপদের ইতিহাস ঐতিহাসিক ভূগোলের বিষয়বস্তু। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণে মানচিত্রের ক্রম-পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনে মানব-ইতিহাসকে অল্পমাত্রায় উন্মোচিত করে। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণে মানচিত্রের পরিবর্তনের আধারে বিধৃত হয় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পালাবদল। মানব ইতিহাসের রহস্য উন্মোচনে যেহেতু জন-জাতি ও জনপদের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ, নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের ইতিহাস-চর্চায় নৃতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত করে সাম্প্রতিককালে গবেষণার প্রবণতা প্রবল হয়েছে।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায় গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, তার ফল তাঁকেই যেমন ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ দেখাবে, তেমনি নতুন প্রজন্মের গবেষকদেরও পথ দেখাবে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রম-লব্ধ তথ্য-সম্বলিত বর্তমান পুস্তকখানি সমঝদার পাঠকবর্গের মূল্যায়নের দ্বারা ভবিষ্যতে সমৃদ্ধতর হবে, বিশ্বাস করি।

ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ই জুন, ১৯৯৮

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঐতিহাসিক ভূগোল নিয়ে গবেষণার কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এমন কি, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভূগোল নিয়েও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের "Historical Geography of Ancient Bengal"। এই রকম প্রদেশভিত্তিক কাজ যখন হয়েছে, তখন পণ্ডিতরা বলতে শুরু করেছেন যে, আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার এই প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হবে। একথা সত্য যে, সামগ্রিকভাবে একটি মহাদেশ, দেশ বা প্রদেশের ইতিহাস রচনা করার যে প্রয়াস করা হয়ে থাকে, তাতে অনেক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তথ্য বাদ পড়ে যায় গবেষকের অলক্ষ্যে। আমাদের মনে হয় যে প্রদেশ থেকে আরও ক্ষুদ্রতর অঞ্চল নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বলাবাহুল্য, সাম্প্রতিক কালে জেলাস্তরে কাজ শুরু হয়েছে। কেউ কেউ আবার জেলার উপরিভাগ, এমন কি একগুচ্ছ গ্রাম নিয়েও কাজ করেছেন। ইংরাজীতে আজকাল একটি শব্দ প্রচলিত হয়েছে বিশেষতঃ নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে। সেই শব্দটি হলো 'Micro Study' অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রয়াসে অনুসন্ধান বা গবেষণা। বস্তুতপক্ষে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকরা একটি ক্ষুদ্র সীমিত অঞ্চল অথবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি দীর্ঘকালের চেষ্টায় আবিষ্কার করেছেন। যাইহোক ঐতিহাসিক ভূগোলের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে যে বাংলা দেশের একটি সীমিত অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করলে এমন কিছু নূতন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে যা বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোলকে বুঝতে সাহায্য করবে। তাই প্রবন্ধের বিষয় হলো— "গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল"।

বিষয়টি নির্বাচন করার একাধিক কারন আছে। প্রথমত,বিভিন্ন সময়ে জনপদ কথাটিকে পেয়েছি এবং দেখেছি যে সমাজের বিবর্তনে জন এবং জনপদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীনকালে গৌড় নামে একটি জনপদ ছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের সামনে এসেছে ভারতবর্ষের

প্রাচীনকালের নগরায়ণের সমস্যা। আমরা দেখেছি সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রথম নগরায়ণ, তারপর প্রায় এক হাজার বৎসর নগরের কোন চিহ্ন ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় নগরায়ণের সূচনা, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নগরায়ণের অগ্রগতি এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নগরায়ণের একটি চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ গুপ্তযুগ থেকে এই নগরায়ণের আবার অবনতি দেখা দেয়। যাইহোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনকালে বাংলা দেশে গৌড় নামে একটি নগরী ছিল। অথচ আমরা জানি না যে, সেই নগরীটির উদ্ভবের পশ্চাতের ইতিহাস কি ভাবে এগিয়েছে। আমরা জানি না যে, উত্তর ভারতের নগরায়ণে যে পর্যায়গুলি পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, তার কোন পর্যায়ের সঙ্গে গৌড় নগরীর উদ্ভবকে যুক্ত করা যায় কিনা ?

তৃতীয়ত, আমরা দেখেছি যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল সমাজ বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে। জানা গেছে যে, সমাজ ব্যবস্থা যখন পরিবর্তিত হয়ে শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ এলো তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে নগরায়ণের পর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন আগে রাষ্ট্র তারপর নগরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে নগর এবং রাষ্ট্র এই দুইটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল একটি সাধারণ প্রেক্ষাপটে, তা হলো কৃষির দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন। এই উদ্বৃত্তের প্রয়োজন যেমন নাগরিক সমাজে তেমনি প্রয়োজন রাষ্ট্রের। কাজেই গৌড় নগরের উদ্ভব পূর্বে হয়েছিল না গৌড় রাষ্ট্র তারও পূর্বে এসেছিল, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে মনে দেখা দিয়েছে।

চতুর্থত, এযাবৎকাল ঐতিহাসিক ভূগোল আলোচনায় কেবলমাত্র বিভিন্ন যুগে বিশেষ একটি স্থানের বা নগরের বা জনপদের ভৌগোলিক সীমা, অবস্থান ইত্যাদির ক্রমবিবর্তন দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে ভৌগোলিক এই সীমা ও অবস্থানের ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। কাজেই এই সমস্যাটিও আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাচীন গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা

কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। প্রথম ও প্রধান সমস্যা হলো যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব। বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন সাহিত্যে ও লেখে গৌড় নগর বা জনপদের উল্লেখ কখনো কখনো পাওয়া যায়, আবার গৌড় বাংলাদেশের যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয় সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে খনন কার্যের ফলে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা "বাণগড়" এবং "মহাস্থানের" কথা উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু সেই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা তা বোঝা দুঃসাধ্য। কারণ মহাস্থানে অবস্থিত পুণ্ড্র নগরী যে গৌড়, তার কোন সুস্পষ্ট সাহিত্যগত প্রমাণ নেই। আবার দেশীয় সাহিত্যে যেমন, বৈদেশিকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তেমনি গৌড়ের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। এই অবস্থায় আমাদের প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং যুক্তিসঙ্গত অনুমানের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে হয়েছে।

দ্বিতীয় যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছি তার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই গৌড় নগরীর উদ্ভব কি গৌড় রাষ্ট্রের পূর্বে হয়েছিল, অথবা গৌড় জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল তার কেন্দ্রে কি গৌড় নগরী অবস্থিত ছিল অথবা গৌড় নগরীকে কেন্দ্র করে গৌড় জনপদ গড়ে ওঠে! এই সমস্যাটি এমনি দুরূহ যে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এর সঠিক সমাধান সম্ভব নয়। তথাপি আমরা চেষ্টা করেছি একটি যুক্তিসঙ্গত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে গৌড় নগরী গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এবং তারা এও বলেছেন যে গঙ্গা নদীর স্রোতধারা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার ফলে সেই নদীর তীরবর্তী নগর ও জনপদগুলির অবস্থান ও সীমানারও পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ মধ্যযুগ পর্যন্ত গৌড় বলতে যে অঞ্চলটিকে বুঝায় তা হলো বর্তমান উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত মালদহ জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত একটি স্থান, যেখানে হোসেন শাহী বংশের আমলের কিছু স্মৃতি স্তম্ভাদি এখনো বর্তমান। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মধ্যযুগে প্রাচীন গৌড় নগরের নামটি কেন গৃহীত হয়েছে? তাহলে কি তার পিছনে কোন ট্র্যাডিশান বা ঐতিহ্য বজায় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর "Geography of Ancient and Medieval India" নামক গ্রন্থে গৌড়

প্রসঙ্গে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন সেখানে তিনি তার আলোচনার সূত্রপাত করেছেন মধ্যযুগের গৌড় থেকে।

চতুর্থত, আর একটি সমস্যা এখানে দেখা দিয়েছে, সেটি হলো—পঞ্চগৌড়ের অবস্থান। বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন সাহিত্যে ও লেখে পঞ্চগৌড়ের মাত্র কয়েকটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং সেই উল্লেখ থেকে কোনো মতেই নির্দিষ্টভাবে পঞ্চগৌড়ের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভাবে কোন ধারণা করা দুঃসাধ্য। তথাপি আমরা চেষ্টা করেছি রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটির সমাধান অনুসন্ধান করতে।

পঞ্চম যে সমস্যাটি তা হলো গৌড় রাষ্ট্র সম্পর্কে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে অনেকগুলি জনপদ ছিল একথা সত্য। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান ছিল দুটি জনপদ—একটি গৌড়, অপরটি বঙ্গ। বঙ্গের অবস্থান ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে আর গৌড়ের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে কতকাংশ এবং গঙ্গানদীর উত্তরে কতকাংশ। কাজেই যে সমস্ত শাসক বাংলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছেন এবং সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন তারা "বঙ্গেশ্বর বা গৌড়েশ্বর" এর যে কোন একটি উপাধিতে ভূষিত হতে পারতেন। বস্তুতপক্ষে পালযুগে প্রতীহার লেখতে যে ধর্মপালকে বলা হয়েছে বঙ্গের অধিপতি, রাষ্ট্রকূট লেখতে তাকেই বলা হয়েছে গৌড়েশ্বর।

কাজেই, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে গৌড় ও বঙ্গ এই দুই জনপদের আর কোন পার্থক্য থাকে নি। তাছাড়া, গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা বার বার বর্দ্ধিত ও সংকুচিত হয়েছে। একথা আমরা বলতে পারি, যদি ধরে নিই, যিনি বাংলাদেশের শাসক ছিলেন তিনিই গৌড় রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখতে হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ শশাঙ্কের আমল থেকে বাংলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য যখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকে বঙ্গ বিহারের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। এমন কি শশাঙ্কের পরে আমরা দেখি বাকপতি রাজের গৌড়বহো নামক প্রাকৃত কাব্যে কৌনজরাজ যশোবর্মনের দ্বারা পরাজিত পূর্ব ভারতের রাজাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাকে কখনো মনে হয় মগধাধিপ আবার কখনো মনে হয়েছে গৌড়াধিপ। কাজেই সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে মগধ এবং গৌড় একই শাসনাধীনে ছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

আবার রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁর "History of North Eastern India" গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, শশাঙ্কের পরবর্তীকালে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ, যাদের শাসনকেন্দ্র ছিল মগধে, তাদের আধিপত্য গৌড়ে বিস্তার করেছিলেন।

গৌড় রাষ্ট্রের একটি পৃথক ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্য, যদি আমরা মনে করি, গৌড় জনপদ আর গৌড় রাষ্ট্র এক নয়। গৌড় রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য জনপদ গুলি যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তবে আমরা গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝব। কিন্তু যে সব তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায় তাতে মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, গৌড় রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীন বাংলার জনপদগুলি নয়, প্রাচীন বিহারের অঙ্গ মগধ প্রভৃতি জনপদ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো গৌড়ের দক্ষিণ সীমানা উড়িষ্যার উত্তরাংশে অবস্থিত "ওড্র" বা উৎকল জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কাজেই, যদি গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, গৌড় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা প্রাচীন বাংলার সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

বর্তমান গ্রন্থে অধ্যায় ভাগ যে ভাবে করা হয়েছে তার পশ্চাতে যে যুক্তি আছে তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমাদের প্রথম অধ্যায় গৌড় নগরী। তার কারণ গৌড়ের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনির **"অষ্টাধ্যায়ীতে"** এবং সেখানে আমরা পাই "গৌড়পুর" নামটি। পুর কথাটি নগর অর্থে সেকালে ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত বৃহদাকার গ্রামগুলিকেও প্রাচীনকালে পুর বলে অভিহিত করা হতো। সেখানে পুরের অর্থ বসতি। কিন্তু পাণিনির সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী আর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয়বার নগরায়ণের সূচনা হয় উত্তর ভারতে। **অঙ্গুত্তরনিকায়** থেকে আমরা জানতে পারি ষোড়শ মহাজনপদের কথা। সেই মহাজনপদের তালিকায় অঙ্গ ও মগধ ছিল। প্রতিটি জনপদের রাজধানী ছিল এক একটি নগর। কাজেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল তা গৌড় পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেনি, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বরঞ্চ নগরায়ণের সূচনার এক শতাব্দী পরে যখন পাণিনি গৌড়পুরের উল্লেখ করেছেন তখন তাকে আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় গৌড় জনপদ। তার প্রধান কারণ সাহিত্যগত উপাদান থেকে আমরা জানতে পারি গৌড় জনপদের উল্লেখ পরবর্তীকালে। এমন কি কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে** গৌড় জনপদের উল্লেখ নেই। সেখানেও গৌড় নগরীর উল্লেখ করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের **কামসূত্রে** এবং বরাহমিহিরের **বৃহৎসংহিতায়** গৌড় জনপদের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গৌড় একটি পৃথক জনপদ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। গৌড় নগরের পর গৌড় জনপদের আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, আমরা ধরে নিয়েছি গৌড় নগরকে কেন্দ্র করেই জনপদটি গড়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র কালানুক্রম অনুযায়ী যে ভাবে নগর ও জনপদের উল্লেখ পেয়েছি সেই পারম্পর্য আমাদের এই গ্রন্থে বজায় রেখেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো গৌড় রাষ্ট্র। ইতিপূর্বে আমরা গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কিত সমস্যার কথা বলেছি, তবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গৌড় রাষ্ট্রের উদ্ভব গৌড় জনপদেরও পরবর্তীকালে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে গৌড় একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয় নি। সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে—প্রাচীন গৌড় জনপদকে ভিত্তি করেই গৌড় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো তখন গৌড়জনপদের অন্য জনপদ থেকে আর কোন পার্থক্য থাকলো না, কারণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয় একাধিক জনপদ। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে নগর এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব যদি একই সময়ে হয়ে থাকে তাহলে গৌড় নগরের উদ্ভব হলো অতি প্রাচীনকালে এবং গৌড় রাষ্ট্রের আবির্ভাব হলো অনেক পরবর্তীকালে—এর ব্যাখ্যা কিভাবে করা যেতে পারে? খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যখন গৌড় নগরীর উদ্ভব হয়েছিল তখন সেই নগরীটি মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ ষোড়শ মহাজনপদের একটি অন্যতম মহাজনপদ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

এই কারণে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহাস্থানে প্রাপ্ত লেখটি প্রমাণ করে যে গৌড় নগরী যেখানে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয় সেই গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল (এখানে আমরা উত্তর এবং দক্ষিণ—দুই তীরকে অন্তর্ভুক্ত করেছি) মৌর্যদের শাসনাধীন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল। একথা সকলেরই জানা যে মৌর্যরা নন্দদের এবং নন্দরা শৈশুনাগদের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কাজেই এইদিক থেকে বিচার করলে অতি প্রাচীনকালে গৌড় নগরের উদ্ভব অসঙ্গত বলে মনে হবে না। পরবর্তীকালে সেই গৌড় নগরী শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এমন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যে সেই নামটি জনপদের নাম হিসাবে ব্যবহার করতে জনপদবাসীর অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উত্তর রাঢ়া বলতে যে জনপদটিকে বোঝায় পরবর্তীকালে সেইটি গৌড় জনপদ নামে পরিচিত হয়। অবশ্য উত্তর রাঢ়ের সঙ্গে বরেন্দ্রী জনপদের কতকাংশ যুক্ত হয়েছিল গৌড় জনপদের সঙ্গে। কাজেই গৌড় জনপদের আবির্ভাব প্রাচীন বাংলার জনপদগুলিতে পশ্চিম দেশ থেকে আগত আর্যীকরণের একটি স্তর বলে মনে করা অসমীচীন হবে না। কারণ গৌড়ের মাধ্যমে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে আর্যভাবধারা এসেছিল। কারণ আর্য ভাবধারার যাঁরা ধারক ও বাহক সেই শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল গৌড় নগরীর পশ্চাতে। এই কারণে গৌড় নগরীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল এই যুক্তিকে দাঁড় করানো যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বৃহত্তর গৌড় পরিমণ্ডলের ধারণা (পঞ্চগৌড়)। এই বিষয় সম্পর্কিত সমস্যাদির উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তবে কলহণের **"রাজতরঙ্গিণীতে"** যে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে আর **স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে** পঞ্চগৌড়ের আমরা যে পরোক্ষ উল্লেখ পাই তার মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাক্-পালযুগে পঞ্চগৌড়ের ধারণা বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু পাল যুগে যখন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরভারতে পালদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন স্বাভাবিকভাবে গৌড়ের সীমানা রাজনৈতিক দিক থেকে বর্ধিত হয়েছিল পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত। সেই কারণে আমাদের মনে হয়েছে যে পালযুগে যে গৌড়ীয়লিপি, গৌড়ীয় ভাষা, কাব্যে গৌড়ীয় রীতি এক কথায় গৌড়ীয় সংস্কৃতি এক বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল সেই যুগে গৌড় নামটি বিহারের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত আর্যাবর্তের অধিবাসীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই কারণে আদি-মধ্য যুগে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে

আর্যাবর্তের আর এক নাম ছিল গৌড়। এই তথ্য আমরা সমসাময়িক লেখ থেকে জানতে পারি।

মনে হয় যে রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রভাব যুক্ত হওয়ার ফলে গৌড়ের ধারণা এত বিস্তার লাভ করেছিল। গৌড়ীয় ধর্ম প্রচারক ও পণ্ডিতেরা ভারতে এবং ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও বিস্তারে যে অবদান রেখে গেছেন তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হলে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ভিত্তি ক'রে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, পঞ্চগৌড়ের ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে গৌড়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের দীর্ঘ ইতিহাস।

বর্তমান কার্যে আমরা বিভিন্ন উপাদান যথা দেশীয় সাহিত্য, বৈদেশিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং লেখমালা ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংকলন করেছি। প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা বিভিন্ন উপাদানের যে বিশ্লেষণ করেছেন তাকেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছি। তবে অনেক সময়ে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি আমাদের দৃষ্টিতে যে তথ্যাদি উপস্থাপিত করে তার সঙ্গে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের উপস্থাপনায় মিল হয় নি। সেক্ষেত্রে আমরা যথোপযুক্ত প্রদর্শনের দ্বারা আমাদের ভিন্ন মত পোষণের কারণ দেখিয়েছি। এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিনয়চন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায় এবং দীনেশচন্দ্র সরকারের মতো পণ্ডিতদের মতামত সমালোচনা করতে গিয়ে আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আবার তাঁদের ব্যাখ্যা অনেক জায়গায় আমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হওয়ায় তা আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এন. এল. দে এবং বি. সি. ল—যে দু'খানি মূল্যবান ভৌগোলিক কোষগ্রন্থ রচনা করেছেন তা আমাদের বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। তাছাড়া ঐতিহাসিক ভূগোলের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি থেকে আলোচনার সূত্রটিকে অবলম্বন করতে পেরেছি। কাজেই এইভাবে একদিকে মূল উপাদান এবং অন্যদিকে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তবে এই কাজটি করার সময় সর্বদাই

আমাদের দৃষ্টিতে ছিল ঐতিহাসিক ভূগোলের প্রেক্ষাপটে সমাজ পরিবর্তনের ধারা অথবা অন্য ভাবে বলা যায় সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ভূগোলের বিশ্লেষণ।

এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়েছি। যেমন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারি, এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলিকাতা), জাতীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা), মালদহ মিউজিয়াম, দুর্গাপুর অনুরূপা দেবী গ্রন্থাগার এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। এইসব গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গ্রন্থ রচনায় আমি যাদের কাছ থেকে উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি, আমার মা শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় এবং বাবা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাইবোন সকলে যে ভাবে আমায় উৎসাহিত করেছেন, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। বিশেষতঃ আমার মা সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এরই সঙ্গে আমি যার কাছে-কন্যাস্নেহে এই কার্যে প্রেরণা পাই, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী কণিকা চট্টোপাধ্যায়কে আমার শ্রদ্ধা জানাই। পরিশেষে যার স্নেহ এবং শিক্ষায় আমি এই স্তর পর্যন্ত আসতে সমর্থ হয়েছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সর্বপরি বইটির প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায়

৪/১৫ সুনীতি চ্যাটার্জী পথ,
সিটি সেণ্টার, দুর্গাপুর-৪।

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

আই. ই. জি—ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাপিক্যাল গ্লসারি

আই. ই—ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাপি

আই. এইচ্. কিউ—ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটারলি

আই. সি—ইণ্ডিয়ান কালচার

আই. এ—ইণ্ডিয়ান এ্যানটিকুইটি

জে. এ. এস. বি—জার্নাল অভ এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল

জে. এ. এস—জার্নাল অভ এশিয়াটিক সোসাইটি

জে. বি. আর. এস—জার্নাল অভ বিহার রিসার্চ সোসাইটি

জে.আর.এ.এস.বি—জার্নাল অভ দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল

ই. সি—এপিগ্রাপিয়া ইণ্ডিকা

জি. ডি. এ. এম. আই—জিওগ্রাপিক্যাল ডিক্সনারী অভ এনশেণ্ট অ্যাণ্ড মিডিএভ্যাল ইণ্ডিয়া

জি. এ. এম. আই—জিওগ্রাপি অভ এনশেণ্ট অ্যাণ্ড মিডিএভ্যাল ইণ্ডিয়া।

।। সূচীপত্র ।।

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

গৌড় নগর

ভূমিকা

বর্তমানে গৌড় বলতে আমরা বুঝি হোসেন শাহের গৌড়। এটি মধ্যযুগের হলেও গৌড় নামটি মধ্যযুগের নয়। সেই কারণে আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধারণা করতে পারি যে, প্রাচীনকালের এই নামটি মধ্যযুগেও রয়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগে গৌড় কোথায় অবস্থিত তা আলোচনা করলে মানচিত্রে প্রাচীন গৌড় নগরের সম্ভাব্য অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্বভারতে গৌড় মুসলিম শাসকদের অন্যতম শাসন কেন্দ্র হয়েছিল। এই গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ গঙ্গা নদীর উত্তরে অর্থাৎ বাম তীরে এবং মালদহ জেলার দক্ষিণে আবিষ্কৃত হয়।[১] জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে আজও মুসলিম আমলের কিছু স্থাপত্যকীর্তি দণ্ডায়মান। ষোড়শ শতকে আগত জনৈক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী গৌড় নগরের অবস্থান এই অঞ্চলেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে গৌড় নগর গঙ্গানদীর ধারে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় দুই লক্ষ বসতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং একদিকে গঙ্গানদী ও অপর দিকটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আগত অপর একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এই শহর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "We spent three hours in seeing the ruins especially of the place which has been…in my judgment considerably bigger and more beautiful than the Grand Seignor's Seraglio at Constantinople or any other place that I have seen in Europe."[2]

সুতরাং উক্ত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে মধ্যযুগে গৌড়ের অবস্থান পাওয়া গেল গঙ্গা নদীর তীরে। ডি. ব্যারস্ (১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে), গ্যাসটালডি (১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে) এবং টলেমির মানচিত্রে গৌড় নগরকে

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে দেখানো হয়েছে।[৩] জানা যায় যে, রাজমহল পর্বতের কাছ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে গঙ্গা নদী উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক কালিন্দী-মহানন্দার নিম্ন ধারার সাথে মিলে গৌড় নগরকে পশ্চিমে রেখে এর পর কিছুটা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকে এই ধারা সরস্বতী নদীর মাধ্যমে সাগরে পতিত হয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, গঙ্গার মূল ধারা ভাগীরথীতে প্রবাহিত হয়েছে।[৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার গঙ্গার প্রবাহ পথ আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বে সম্ভবতঃ গৌড়নগর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।[৫] কারণ, ষোড়শ শতকের আগে গঙ্গা বর্তমানের তুলনায় আরও উত্তর ও পূর্ব অভিমুখী ছিল। ষোড়শ শতকের পর গঙ্গার প্রবাহ পথ ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে সরে আসে। বর্তমানে অবশ্য প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথী (হুগলী) ও পদ্মা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী যুগে গৌড় নগরের অবস্থান বর্তমান মালদহের দক্ষিণে, গঙ্গার বামতীরে অবস্থিত ছিল।

(খ)

গৌড় নগরের প্রাচীন উল্লেখ

গৌড় নগরের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পাণিনির **অষ্টাধ্যায়ীতে** (৬, ২, ৯৯)। এখানে গৌড়পুর এবং অরিষ্টপুরের উল্লেখ করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সরকার **অষ্টাধ্যায়ীর** উল্লেখের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে, গৌড়পুর পূর্বভারতে আর্যীকৃত অঞ্চলের বহির্ভূত ছিল। এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, পাণিনির সময়ে পূর্বভারতে বঙ্গদেশ অঞ্চলটি আর্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত ছিল। সুতরাং, সঙ্গত কারণে আমরা পাণিনির গৌড়পুরকে প্রাচীন গৌড় নগরের সাথে অভিন্ন বলে মনে করতে পারি। আবার, পাণিনির **অষ্টাধ্যায়ীতে** (৬, ২, ১৪২) পূর্বভারতের দুইটি নগরের উল্লেখ করা হয়েছে। এক, মহানগর ; দুই, নবনগর। মহানগর—প্রাচীন মহাস্থানগর এবং নবনগর—প্রাচীন নবদ্বীপ বলে মনে করা হয়।[৬] মহাস্থানেই প্রাচীন পুণ্ড্রনগর অবস্থিত ছিল বলে মহাস্থানগড় প্রস্তর লেখ থেকে জানা যায়।[৭]

গৌড়পুর ও পুণ্ড্রনগর সন্নিকটবর্তী বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না, যদি সাহিত্যগত উপাদানের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মিলিয়ে দেখতে হয়। মোট কথা, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গৌড় পূর্ব ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

গৌড় নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে**। এখানে 'গুড়' উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে গৌড়ের উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] গুড় সাধারণত উৎপন্ন হয় ইক্ষু থেকে। গৌড় নগর ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা যায়। **রামচরিত** থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী অঞ্চল ইক্ষু উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। 'পুণ্ড্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইক্ষু (গুড়)। ইক্ষু এবং তার থেকে উৎপন্ন গুড় সমার্থক ছিল। তাই গৌড়পুর ও পুণ্ড্র নগরের মধ্যে একটি নৈকট্য লক্ষণীয়। পাণিনির **অষ্টাধ্যায়ী** এবং কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র** ছাড়া অন্যত্র গৌড় নগর অপেক্ষা গৌড় জনপদের উল্লেখ বেশী পাওয়া যায়।

গৌড়পুর বা গৌড় নগরকে কেন্দ্র করে গৌড় জনপদ গঠিত হয়েছিল, অথবা গৌড় জনপদের নামে নগরীটির নাম হয়েছিল, তা নিয়ে এখনো সংশয় বর্তমান। কালানুক্রমের বিচারে, যে সব উপাদান থেকে গৌড় নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা প্রাচীনতর। গৌড় জনপদের উল্লেখ রয়েছে পরবর্তীকালের উপাদানে। অতএব, গৌড় জনপদের আবির্ভাবের পূর্বেই গৌড় নগরের আবির্ভাব হয়েছিল, একথা মনে করা যেতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম জনপদ ছিল মগধ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মগধ সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে গৌড়ের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, সমগ্র ভারতে নগরায়ণের সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং চতুর্থ শতাব্দীতে নগরায়ণ পরিণতি লাভ করে। এই সময়ে গৌড় নগরের আবির্ভাব হয়েছিল ক্রমশঃ বিস্তারশীল মগধ সাম্রাজ্যের মধ্যেই। নগরের সঙ্গে জনপদের যদি পার্থক্য করা হয়, তবে জনপদ বলতে বোঝায় গ্রামাঞ্চল, যেখানকার উদ্বৃত্ত উৎপাদন নগর-উদ্ভবে সহায়তা করে।

(গ)

গৌড় নগরীর অবস্থানের পরিবর্তন

গৌড় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে মৌর্য যুগ থেকে নগর-বসতি গড়ে ওঠার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় পুনর্ভবা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত বাণগড়ে মৌর্যযুগ থেকে নগর বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মৌর্যযুগের স্তরে পাওয়া গেছে—"N. B. P., a ringwell terracottas and punch-marked silver and copper coins" শুঙ্গ যুগের স্তরে একই মুদ্রা পাওয়া যায়, তাছাড়া "Buildings, drains, cesspits, and a brick-built rampart wall." গুপ্ত যুগের "Walls, terracotta beads, copper and ivory sticks, iron implements"—এবং পাল যুগের "rampart wall, lotus-shaped small tank, carved bricks and stone sculpture" প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত উপাদানাদির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯] এইসব উপাদান থেকে সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকে না যে, মৌর্যযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত বাণগড়ে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরবসতি বর্তমান ছিল।

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার বগুড়া শহর থেকে আট মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরের বাঁকে মহাস্থানগড়-এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই দুর্গনগরীর আয়তন প্রায় ৫০০০ × ৪৫০০ ফুট।[১০] আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম প্রধানতঃ হিউ-এন-সাঙ এর বিবরণের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে মহাস্থানগড় প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহাস্থানগড়ে মৌর্যযুগের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের আবিষ্কার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই লেখতে "পুণ্ড্র' নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই লিপি থেকে জানা যায় যে, পুণ্ড্র নগরের মহামাত্র দুর্ভিক্ষ পীড়িত অধিবাসীদের মধ্যে কোষ্ঠাগার থেকে ধান্যশস্য এবং কোষাগার থেকে অর্থ (গণ্ডক ও কাকনিক) ঋণ হিসাবে দানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১১]

মহাস্থানগড়ের চার দেওয়ালে চারটি তোরণ আছে। গড়ের সংলগ্ন এলাকায়

রয়েছে মসজিদ, মাজার, খোদার পাথর ভিটা (মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ), মানকালীর কুণ্ড (মজে যাওয়া পুকুর), পরশুরামের বাড়ী, জীয়ৎ কুণ্ড (জীবন কূপ), বৈরাগীর ভিটা, মুনির থোন, গোবিন্দ ভিটা, শিলাদেবীর ঘাট, গোকুল মেড়, নেতাই বৈরাগীর পাট, পরশুরামের সভাবাটী, স্কন্দের ধাপ, গোপীনাথের ভিটা, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ী, মঙ্গলকোট বা পদ্মাবতীর ধাপ, খামার ধাপ, মঙ্গলনাথের ধাপ, এর পতির ধাপ, সন্ন্যাসীর ধাপ, যোগীর ভবন, বিহার গ্রাম, ভাসুবিহার, ভীমের জাঙ্গাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২] এইসব স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে মৌর্য থেকে গুপ্তযুগের প্রত্নবস্তু।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির ফলক চিত্র, অলঙ্কৃত ইট, পাথরের তৈরী নানা দ্রব্য, স্বল্প মূল্যের পাথরের গুটিকা ও বোতাম, লোহা, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী নানা দ্রব্য, পোড়ামাটির বল, ক্ষেপণীয় গোলক, অলঙ্কার, কড়ি এবং ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত গোলাকার ও চতুষ্কোণ মুদ্রা (Punch-marked and cast coins)। অসংখ্য মৃৎপাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এন. বি. পি.। শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির চিত্রফলক এবং গুপ্তযুগের লিপি উৎকীর্ণ সীল ও মুকুট পরিহিত রমণীর মস্তকদেশ উল্লেখযোগ্য।[১৩] পাল আমলের অসংখ্য মন্দির, স্তূপ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইটি সাধারণভাবে মহাস্থানের প্রত্ন উপাদানের পরিচয়। গোবিন্দ ভিটায় গভীর খনন-কার্যের ফলে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেও এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল।[১৪] কিন্তু সে সময়ের কোন ইমারতের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এর ভিত্তিতে মনে করা যেতে পারে যে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে করতোয়া নদীর অববাহিকায় নগরায়ণের সূত্রপাত হয় নি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে দেখা গেল যে, প্রাক্-মৌর্য যুগেও মহাস্থানে বসতি ছিল। তার থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে পুণ্ড্রবর্ধন জনপদে বসতি গড়ে উঠেছিল প্রাক্-মৌর্য যুগ থেকে। পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় **ঐতরেয় ব্রাহ্মণে**। তাদের দস্যু বা অনার্য বলা হয়েছে। **মহাভারতের** সভাপর্বে দিগ্বিজয় অধ্যায়ে পুণ্ড্র জাতিকে মুঙ্গেরের পূর্বদিকের অধিবাসী বলা হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত পুণ্ড্রনগরে যেমন গৌড়েরও তেমনি প্রাক্-মৌর্যযুগ থেকে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে, বসতি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগ পর্যন্ত গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট

সঙ্গত কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'পুণ্ড্র' ও 'গৌড়' নাম দুটির ব্যুৎপত্তিগত সমার্থকতার কথা বলা হয়েছে। মহাস্থানের অবস্থান করতোয়ার তীরে, বাণগড়ের অবস্থান পুনর্ভবার তীরে এবং গৌড়ের অবস্থান গঙ্গার তীরে ছিল। কিন্তু এই তিনটি নগর-বসতির আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। যেহেতু গৌড়কে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে, প্রাচীন গৌড় নগর গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

কর্ণসুবর্ণ ঃ

গুপ্তোত্তর কালে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় নগরের অবস্থান পরিবর্তিত হয়। শশাঙ্কের অধিকারে যে গৌড় জনপদ ছিল তার কেন্দ্র রূপে যে নগরীটিকে আমরা দেখি তা হলো কর্ণসুবর্ণ। সেই অর্থে আমরা একে গৌড় নগরী বলে অভিহিত করতে পারি। কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্পর্কে আজ আর পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই। কারণ মুর্শিদাবাদে "রাজবাড়ী ডাঙ্গায়" যে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্য হয়েছে তাতে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। হিউ-এন-সাঙ এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ মহাবিহার কর্ণসুবর্ণের সীমান্তে ছিল।[১৫]

শশাঙ্কের পরবর্তীকালে যখন প্রাচীন বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তখন গৌড় জনপদে তথা গৌড় নগরীতে সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই সময়ে খুব সম্ভবতঃ গৌড় নগরীর অবস্থান কর্ণসুবর্ণতেই ছিল। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ও এই একই মত ব্যক্ত করেছেন।[১৬] অবশ্য কলহণের **রাজতরঙ্গিণী** (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতঃ) থেকে যে "পঞ্চগৌড়ের" উল্লেখ আমরা পাই তা থেকে মনে হয় যে, বঙ্গদেশ তখন যে কটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তার প্রত্যেকটিকে "গৌড়" বলে অভিহিত করা হয়েছে। গৌড় নামক পাঁচটি রাজ্যকেই পুণ্ড্রবর্ধনের রাজার অধীনে আনা হয়েছিল। কিন্তু এই তথ্যের দ্বারা মূল গৌড় নগরীর অবস্থান জানা যায় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, যেহেতু বঙ্গদেশের প্রতিটি স্বতন্ত্র রাজ্যকে 'গৌড়' বলা হতো, সেই কারণে এই সময়ে মূল গৌড়ের অবস্থান শশাঙ্কের আমলে যেখানে ছিল সেখান থেকে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে নি।

আধুনিক পণ্ডিতগণ মাৎস্যন্যায়ের একশতাব্দী কালের ইতিহাস গৌড় ও বঙ্গ এই দু'টি জনপদে ভাগ করে দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে গৌড়ের অবস্থান হলো ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আর বঙ্গের অবস্থান ভাগীরথীর পূর্বতীরে। সেইদিক থেকে বিচার করলে কর্ণস্বর্ণের দাবী আগের মতই বজায় থাকে। পরবর্তীকালে পাল যুগে ধর্মপাল যখন তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারতে স্থাপন করেন, তখন তাঁর রাজধানী (জয়স্কন্ধাবার) ছিল পাটলিপুত্রে। সমসাময়িককালে রাষ্ট্রকূট লেখ মালায় তাঁকে 'গৌড়ের অধিপতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু পাটলিপুত্রকে কোনক্রমেও গৌড়ের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা যায় না। তিব্বতী ট্র্যাডিশান থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ধর্মপাল উত্তরবঙ্গে সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন। সোমপুর ও পাহাড়পুর অভিন্ন। সেকালে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল পাহাড়পুর। কাজেই, রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে রাজধানী পাটুলিপুত্রে থাকলেও পালরা তাঁদের রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে গৌড়ের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। এখানে গৌড়কে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

রামাবতী ঃ

এই অনুমানের দু'টি কারণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মহীপালের রাজত্বে **বাণগড় লেখ** (পশ্চিমদিনাজপুর জেলা, নবম রাজ্য বর্ষ)[১৭] এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত** থেকে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গে পালদের পিতৃভূমি বা "জনকভূ" ছিল। দ্বিতীয়ত, রামপালের রাজত্বকালে প্রজা বিদ্রোহের পর **রামাবতী** নামে নগরীটি নির্মিত হয়েছিল। এই রামাবতীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, **রামচরিতে** বলা হয়েছে রামাবতী নগর বরেন্দ্র ভূমিতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল। রামাবতীর জগদ্দল বিহারে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। **সেখ শুভদয়া** নামক (মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার মসজিদে প্রাপ্ত) হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে প্রথম রামাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে, রামাবতী নগর পশ্চিমদিনাজপুর-এ অবস্থিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। রামাবতী পালযুগে প্রাচীন গৌড় নগরীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল।

পালযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, যখনই পালরা উত্তরবঙ্গে তাঁদের অধিকার হারিয়েছেন, তখনই তাঁরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং সমগ্র বঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব ও আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন যে, পালদের সবকটি জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানী রামাবতী সমেত গঙ্গার ধারে অবস্থিত ছিল এবং গঙ্গা নদীর স্রোতধারা পরিবর্তনের জন্য পাল রাজারা তাদের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে গৌড়ে অর্থাৎ বর্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে (মালদহ জেলার নিকটে) সেখানে নিয়ে যান।[১৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রামাবতী যেখানে অবস্থিত ছিল সেখান থেকে গঙ্গানদী কিছুটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হতো। কারণ এই সময়ে গঙ্গার স্রোতধারা অনেকটা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছিল।

পালযুগের ট্র্যাডিশান সেন যুগেও বজায় ছিল। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সেন যুগেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। যখন বিজয় সেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন (আনুমানিক ১০৯৬ থেকে ১১৫৯ খ্রীঃ), তখন তিনি পাল বংশের শেষ রাজা 'গৌড়েশ্বর' মদনপালকে মালদহ জেলার কালিন্দী নদীর নিকটে পরাজিত করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। মদনপাল যে তখনও 'গৌড়েশ্বর' ছিলেন, তা তাঁর উত্তরবঙ্গের আধিপত্য ছিল বলে। অতএব সেন যুগের প্রারম্ভে আমরা আবার গৌড়কে উত্তরবঙ্গে অনুসন্ধান করতে পারি।

বিজয়পুর ঃ

বল্লাল সেন রচিত **দানসাগর** গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বিজয় সেন বিজয়পুর নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে বর্তমান রাজশাহী জেলার সাত মাইল পশ্চিমে গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রাম অবস্থিত। এর উত্তরে চব্বিশ নগর এবং বিজয়নগর নামে দুইটি গ্রাম বর্তমানে অবস্থিত আছে।[১৯] এর সাত মাইল পূর্বে একটি স্থান থেকে বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বিজয়পুর ও নবদ্বীপ এক। আবার অনেকে মনে করেন বিজয়পুর বিজয় সেনের বিজয় কীর্তি বহন করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজয় সেনের বিজয়কীর্তি খোদিত আছে দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে।

অতএব দেওপাড়ার নিকটবর্তী স্থানে যদি আমরা বিজয় সেনের বিজয়পুরের অনুসন্ধান করি তা হলে খুব অযৌক্তিক হবে না। এবং সেক্ষেত্রে বিজয়পুরকেই সেন যুগে গৌড়ের আর এক সংস্করণ বলে মনে করা যায়।

লক্ষ্মণাবতী ঃ

অবশ্য বিজয় সেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন নি। যিনি প্রথম এই উপাধি সেন রাজা হিসাবে গ্রহণ করেন তিনি হলেন লক্ষ্মণসেন। তাঁর রাজধানী ছিল দু'টি—একটি গঙ্গার উত্তর তীরে লক্ষ্মণাবতী ও অপরটি ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপ বা নদীয়ায়। ধোয়ীর **পবনদূতে** লক্ষ্মণসেনের রাজধানী হিসাবে বিজয়পুরের কথা বলা হয়েছে। রমাপ্রসাদ চন্দ বিজয়পুর বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর বলে মন্তব্য করেছেন।[২০] **পবনদূতের** বর্ণনা অনুযায়ী বিজয়পুর গঙ্গার তীরে ত্রিবেণীর নিকট অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মণসেন যখন লক্ষ্মণাবতী নগরীটির নির্মাণ করেন, তখন তিনি তার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের শীর্ষে ছিলেন। সম্ভবতঃ, লক্ষ্মণসেন প্রাচীন গৌড় নগরীর কিছু সংস্কার সাধন করে এর নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। বিজয়পুরের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু পণ্ডিতরা সকলেই একমত যে, লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের সেন-সংস্করণ।

জৈন প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে, গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। অপর দিকে মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিন দাবী করেছেন যে, এই লক্ষ্মণাবতী (লক্ষ্ণৌতি) মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এর নামকরণ এবং অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এটি লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্ভবতঃ রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে লক্ষ্মণসেন তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে নবদ্বীপে স্থাপন করেছিলেন। এই খানেই বখতিয়ার খলজির আক্রমণের ফলে সেনদের পতনের সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা হলো যে, বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ অধিকার করে গৌড় জয় হয়েছে এই কথা মনে করতে পারেন নি। মিনহাজউদ্দিনের **তবকাৎ-ই-নাসিরীতে** বলা হয়েছে, "মহম্মদই-বখতিয়ার ওই (রায় লক্ষ্মণীয়ার) মুলক সকল দখল করে শহর নৌদিয়াহকে

'খরাব' করলেন এবং সে মৌজা লক্ষণাবতী তার উপর রাজধানী (দারউল মুলক) স্থাপন করেন"। অর্থাৎ নবদ্বীপ বা নদীয়া জয় করে বখতিয়ার খলজি লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হন এবং সেই লক্ষণাবতী জয় করার পরেই বখতিয়ার খলজির গৌড় জয় সম্পূর্ণ হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সময়ে গৌড়ের সাথে উত্তরবঙ্গের একটি সংযোগ বজায় ছিল। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম শশাঙ্ক এবং শশাঙ্কোত্তর কাল।

(খ)

গৌড়পুরের অভ্যুদয়ের পটভূমিকা

নগরায়ণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নগর গড়ে ওঠার কতকগুলি কারণ দেখতে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নগরকে গ্রাম থেকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখছি যে, ক্রশটিগার নগরায়ণের কারণ হিসাবে যোলটি বিষয়ের কথা বলেছেন। পল হুইটলের রচনাতেও আমরা একই অভিমত দেখতে পাই। এগুলির মধ্যে কৃষি উদ্বৃত্ত উৎপাদন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সামরিক বিষয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, ধর্ম, কারিগরী শ্রেণীর উপস্থিতি, বন্দর, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে আমরা গৌড় শব্দের উৎপত্তিগত ব্যাখ্যার আলোচনা করতে পারি। গা+উর–গাউর–গৌর–গৌড় এসেছে বলে মনে করা হয়। দ্রাবিড় ভাষায় 'উর' শব্দের অর্থ নগর। উর শব্দযোগে স্থানের নামকরণ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বর্তমানে দক্ষিণভারতে এই রীতিতে নগরের নামকরণ দেখা যায়। যার উদাহরণ হল ভেল্লর (ভেল্ল+উর), রাণীবেন্নুর (রাণীবেন্ন্+উর)। অর্থাৎ গৌড় শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেও আমরা নগরের ইঙ্গিত পাই।[৩২]

মহাস্থানগড় লেখ'তে যে পুণ্ড্রনগরীর উল্লেখ পাই তার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানতঃ প্রশাসনিক। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনকে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বিভাগ হিসাবে দেখতে পাই। ইতিপূর্বেই আমরা প্রাচীন গৌড় নগরের অবস্থান অনুসন্ধান প্রসঙ্গে পুণ্ড্র নগরের অদূরে তার অবস্থান

দেখাবার চেষ্টা করেছি। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গৌড় নগরীর গুরুত্ব কম ছিল না।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে** পুণ্ড্রকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাস্থানগড় লেখতে রাজাজ্ঞায় রাজকীয় কোষ্ঠাগার থেকে খাদ্যশস্য দানের কথা বলা হয়েছে (ইতিপূর্বে আলোচিত)। এক্ষেত্রে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে এই শস্য স্থানীয় কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্ত থেকে সংগৃহীত হতো। নগরায়নের অন্যতম শর্ত হলো উদ্বৃত্ত উৎপাদন, যার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত কৌশল (অর্থাৎ আমরা এখানে লোহার ব্যবহারের কথা বলতে চাইছি)। ভারতীয় নগরায়নের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যখন থেকে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, তখন থেকে কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন দেখা যায়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে বাণগড় এবং মহাস্থানগড়ে খনন কার্যের ফলে এন. বি. পি., (Northern Black Polishedware) আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে যে স্তরে এন. বি. পি. পাওয়া গেছে সেইখানে লৌহেরও চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। তা'ছাড়া, এমনিতে মহাস্থানে লোহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই লোহার ব্যবহারই কৃষিকার্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সাহায্য করেছিল। উদ্বৃত্ত উৎপাদন স্থানীয় জনগণের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের কাঁচামাল সরবরাহ করে নগরায়নের পথকে সুগম করে। কৌটিল্য তাঁর **অর্থশাস্ত্রে** গৌড়ের উন্নত মানের রৌপ্য খনিজ পদার্থ উত্তোলনের কথা বলেছেন। বাণগড় ও মহাস্থানগড়ের মত গৌড়নগরীও আবির্ভূত হয়েছিল উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদনকে ভিত্তি করে।

মহাস্থানগড় লেখ থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে) গণ্ডক, কাকনিক নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল।[২২] তাছাড়া, বাণগড়ে ও মহাস্থানে প্রচুর পরিমাণে ঢালাই করা ও ছাপযুক্ত মুদ্রা (Cast and Punch-marked coins) আবিষ্কৃত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই সব মুদ্রা নন্দ-মৌর্যযুগে প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে কুষাণরাজ বাসুদেবের এবং গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের কয়েকটি মুদ্রা পুণ্ড্রবর্ধন থেকে আবিষ্কৃত হয়। অতএব, মৌর্যযুগ থেকে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছিল। কড়ি সম্ভবতঃ স্থানীয় বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের এই

চিত্র গৌড়ের পক্ষেও প্রযোজ্য। গঙ্গার তীরে অবস্থিত গৌড় একটি নগর-বন্দরে পরিণত হয়েছিল।

মহাস্থানগড়ের খনন কার্যের ফলে বেশ কিছু মূর্তি এবং পরবর্তীকালে মন্দিরের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে কারিগর, শিল্পী ও পুরোহিত শ্রেণী বসবাস করতেন। ইতিপূর্বে আমরা মহামাত্র নামে শাসক শ্রেণীভুক্ত রাজপুরুষেরও উল্লেখ পেয়েছি। নগরের একটি বৈশিষ্ট্য অনুৎপাদক শ্রেণীর বসবাস। ভি. গর্ডনচাইল্ড নগরায়ণের প্রসঙ্গে বলেছেন—

"The process of urbanization depended on the certain factors like, population, extension of territories, formation of ruling classes, role of the sovereigns, trade and commerce, guild, existence of nonproducing surplus population, professionals, religion, education, knowledge of technology and so on."

গৌড় নগরীর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রযোজ্য হতে পারে। তবে প্রত্যক্ষভাবে আমরা এমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাই না, যার দ্বারা গৌড়ের নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, মহাস্থান ও বাণগড়ের মত গৌড় মৌর্য থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিবেশী দুটি নগর-বসতিতে, মহাস্থান ও বাণগড়ে, নগরায়ণের যে লক্ষণগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আলোকে প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা গৌড় নগরীর পরিচয় বিলক্ষণ ধরা পড়ে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. D. C. Sircar, *Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971. p. 110.

২. Hobson, Jonson, *Gaur*, cited in Sircar's GAMI, Delhi, 1979.

৩. Renell. J, *Memoirs of A Map of Hindusthan on the Mogol Empire*, London, 1783.

৪. Radhakamal Mukherjee, *The Changing Face of Bengal*, 1938, pp. 141-42.
৫. R.C. Majumder, *History of Ancient Bengal*, Calcutta, 1971, p. 2.
৬. B.N. Mukherjee and P. K. Bhattacharjee (ed.), *Early Perspective of North Bengal*, 1987, Darjeeling, p. 32.
৭. *Epigraphia Indica*, Vol. 21, p. 83.
৮. রাধাগোবিন্দ বসাক, **কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র**, কলিকাতা, ১৯৭০ দ্বিতীয়ভাগ, দ্বিতীয় অধিকরণ
৯. K.C. Goswami, *Excavations at Bangarh* (1938-1941), Ashutosh Museum, Memoir No. I.
১০. **ভারতকোষ**, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩০৬
১১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, **বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ**, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৬
১২. **তদেব.**, পৃ. ১৭১-১৮৯
১৩. **তদেব.**, পৃ. ১৮২
১৪. **তদেব.**, পৃ. ১৮৪
১৫. D.C. Sircar, *Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971, p. 113.
১৬. **তদেব.**, পৃ. ১১১ থেকে ১১২
১৭. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, **গৌড়লেখমালা**, কলিকাতা, পৃ. ৯১
১৮. D.C. Sircar, *Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971, p. 112.
১৯. নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৩৭৭
২০. রমাপ্রসাদ চন্দ, **গৌড়রাজমালা**, রাজশাহী, ১৯৩২, পৃ. ১৩
২১. **ভারতকোষ**, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৩
২২. *Historical Quarterly*, 1934, p. 35.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌড় জনপদ

(ক)

জনপদের সংজ্ঞা

ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বিভিন্ন শাখা (Tribe) 'জন' বা 'বিশ' নামে পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদে 'জন' শব্দটি আছে ২৭৫ বার আর 'বিশ' শব্দটি ১৭১ বার।[১] পণ্ডিতেরা বলেন, কতকগুলি 'বিশ' নিয়ে একটি 'জন' গঠিত হতো। 'বিশ' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "যারা বসতি করে"। আর্যরা যতদিন পশুপালন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল ততদিন তারা যাযাবর ছিল। পরে যখন আর্যরা কৃষি অর্থনীতি গ্রহণ করে তখন 'বিশরা' গড়ে তোলে বসতি। কয়েকটি বিশ যখন কোন বসতিতে একত্রিত হয় তখন সেই বসতি হয়ে ওঠে জনবসতি বা জনপদ (Tribal Settlement)।

শুধু জনবসতিই নয়, জনপদ হল রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ, সাতটি অঙ্গের মধ্যে একটি। **অর্থশাস্ত্রে**[২] (৬ষ্ঠ অধি. ১ম অধ্যায়), মহাভারতের **শান্তিপর্বে** (৬৯ অধ্যায়ে) জনপদকে রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ হিসাবে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। আবার **মনুসংহিতা** (৯ম অধ্যায়), **বিষ্ণুস্মৃতি** (৩য় অধ্যায়), শান্তিপর্ব (৬০ অধ্যায়) এবং কামন্দকের **নীতিসারে** (৪র্থ অধ্যায়) জনপদের পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ জনপদ ও রাষ্ট্র সমার্থক হয়ে গেছে। **যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে** (১ম অধ্যায়) জনপদের স্থলে শুধু 'জন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাষ্ট্র' সেক্ষেত্রে ভূখণ্ডের পরিচায়ক আর 'জন' হল শুধু জনগোষ্ঠী অতএব ভূখণ্ড (Territory) ও জনগোষ্ঠী (Population) যুক্ত-ভাবে গড়ে তোলে জনপদ।

আবার কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে** (৬ষ্ঠ অধি. ১ম অধ্যায়) জনপদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সেখানকার অধিবাসীরা হবে প্রধানতঃ শূদ্র বর্ণোদ্ভূত কৃষক। কামন্দকের **নীতিসারে** (৪র্থ অধ্যায়) সেই একই কথা বলা হয়েছে, তারই পাশাপাশি রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ দুর্গের বা রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায়। **অর্থশাস্ত্রের** ২য় অধিকরণে, **মনুসংহিতা** (নবম অধ্যায়) ও মহাভারতের শান্তিপর্বে (৬৯ অধ্যায়) 'দুর্গ' স্থানে 'পুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'দুর্গ' ও 'পুর' সমার্থক ছিল। অর্থশাস্ত্রে জনপদনিবেশ অধ্যায়ের সঙ্গে 'দুর্গ-নিবেশ' অধ্যায় পাঠ করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, জনপদ ও পুরের

মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। জনপদ হল গ্রামাঞ্চল আর 'পুর' হল নগর। কৌটিল্য বলেছেন, এক থেকে পাঁচশত কুল বা পরিবার নিয়ে গঠিত হতো একটি গ্রাম। এই রকম আটশত গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত 'স্থানীয়'। এই রকম কয়েকটি 'স্থানীয়' নিয়ে গড়ে উঠত জনপদ। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে 'পৌর' ও 'জানপদ' যথাক্রমে নগরবাসী ও গ্রামবাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন জনপদের নামকরণ হয়—

(ক) ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী,

(খ) অধিবাসীদের নামানুসারে অথবা

(গ) স্থানীয় উৎপাদন দ্রব্যের নামানুসারে।

অনেকে মনে করেন যে, কোন জনপদের অধিবাসী জনগোষ্ঠী সেই জনপদের নামানুসারে পরিচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে বসবাসকারী উপজাতিগুলির নাম হয় পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ, রাঢ়াঃ ইত্যাদি। আবার উল্টো দিকে থেকেও বলা যায় পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ, রাঢ়াঃ প্রভৃতি উপজাতিদের নামানুসারে তাদের অধ্যুষিত জনপদগুলির নাম হয় যথাক্রমে পুণ্ড্র, গৌড় ও রাঢ়। প্রাচীনকালে কোন কোন জনপদের নামের সঙ্গে সেখানকার বিশিষ্ট কোনো উৎপন্ন দ্রব্যের নাম যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন, 'গুড়' (ইক্ষুজাত) থেকে গৌড় নামটি উদ্ভূত হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে 'বঙ্গাল' জনপদটির উল্লেখ করা যায়। 'বঙ্গ+আল' হয়ে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'আল' হল কৃষি-জমির সীমানা অথবা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে খাড়ি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার দুই ধারে গড়ে ওঠা পলি দিয়ে তৈরী কৃষি জমির সীমানা সদৃশ উঁচু ডাঙ্গা জমি। গৌড়ের ভৌগোলিক অবস্থান মহানন্দা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থলে। কিন্তু এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গৌড় নামটির কোনো সম্পর্ক আপাততঃ দেখা যায় না।

(খ)

জনপদ ও সমাজ বিবর্তন

নৃতাত্ত্বিকদের মতে মানবসমাজ বিবর্তনের আদি পর্বে জনপদের অস্তিত্ব ছিল না। এই সময় মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহকের স্তরে। মানুষ তখন

শিকারের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত বলে নির্দিষ্ট বসতি বলে কিছু ছিল না। এই সময় মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আহারের সন্ধান করত। তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল না। অর্থ নৈতিক কারণে যুদ্ধবদ্ধ এই সমাজকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে "Band Society"। এই সময়-কালকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রত্ন প্রস্তর যুগ বলে অভিহিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই যুগের পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ ক্রমশঃ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদনের স্তরে উপনীত হয়। কৃষিকার্যের দ্বারা শস্য উৎপাদনের ফলে নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণে তারা সফল হয়। রক্তের সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বা জনপদে বসতি করতে শুরু করে। কারণ, যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করলে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হতো না। যাই হোক মানুষ যখন পরস্পরের প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের মত স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখনকার সমাজকে বলা হয় "গোষ্ঠী সমাজ" (Tribal Society)। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাষায় এটি হল 'নব্যপ্রস্তর যুগ'। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এই যুগের পালিস ও মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে জন-নায়কের নেতৃত্বে জনগোষ্ঠীগুলি পরিচালিত হয়। সম্ভবতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, আর্থিক স্বচ্ছলতা, উপজাতীয় আক্রমণজনিত কারণে গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে। গোষ্ঠীভুক্ত যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট থাকলেও তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত গোষ্ঠীপতি বা নায়ক উৎপাদনের সিংহ ভাগের দাবীদার হন। উৎপাদনের উপাদানে পরিবর্তন ঘটে এবং কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সূচনা হয়। এই সমাজকে নাম দেওয়া হয় নায়কতান্ত্রিক গোষ্ঠী সমাজ (Tribal Chief-dom) প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এর নাম দিয়েছেন "তাম্রপ্রস্তর যুগ"। এই যুগে ব্যবহৃত—তৈজস-পাত্রাদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে আসে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ, লোহার আবিষ্কার এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদকের নিকট থেকে শাসক নিয়মিত ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এই সময় একাধিক জনপদ মিলিত হয়ে বৃহত্তর জনপদ এবং একাধিক গোষ্ঠীর মিলনের ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কার সমাজের আখ্যা

দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজ (State Organized Society)। এইভাবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে জনপদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অনেক মহাজনপদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বৌদ্ধ **অঙ্গুত্তরনিকায়** থেকে জানা যায় ষোড়শ মহাজনপদের নাম। পাণিনি তাঁর **অষ্টাধ্যায়ীতে** এই সকল জনপদের উল্লেখ করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের বিবরণ থেকে নন্দ শাসকদের অধীনে শক্তিশালী মগধ মহাজনপদের কথা জানা যায়। গাঙ্গেয় সমভূমিতে জনপদগুলি গড়ে ওঠার যে সূচনা দেখা যায় তার বিস্তৃতি ঘটেছিল নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি পর্যন্ত। **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** পরবর্তীকালের রচনা জৈন 'ভগবতীসূত্রে' ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্ভুক্ত হয় বঙ্গ ও পৌণ্ড্র জনপদ। গৌড় জনপদ খুব সম্ভবতঃ পৌণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্লীন ছিল। পরবর্তীকালে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রের দক্ষিণাংশ ও রাঢ়ের উত্তরাংশ নিয়ে গৌড়জনপদ আবির্ভূত হয়। সেই আবির্ভাবের কাল নিরূপণ করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগত উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়।

(গ)

গৌড় জনপদের প্রাচীন উল্লেখ

পদ্মপুরাণে (১৮৯.২) গৌড়দেশের উল্লেখ আছে, সেখানে রাজা ছিলেন নরসিংহ। বাৎস্যায়নের **কামসূত্রে** গৌড়ের উল্লেখ রয়েছে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধরা মন্তব্য করেছেন যে, গৌড় দক্ষিণের দিকে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩] বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১৪।৬-৮) পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বর্ধমান, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদের সাথে গৌড় জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে। **ভবিষ্যপুরাণে** গৌড় জনপদ উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বর্ধমানের উত্তরে এবং পদ্মানদীর দক্ষিণে গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুরারির **অনর্ঘরাঘবে** চম্পাকে গৌড়ের রাজধানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ মিশ্রের **প্রবোধচন্দ্রোদয়তে** বলা হয়েছে যে রাঢ়াঃ এবং ভূরিশ্রেষ্ঠিক গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী গৌড় জনপদ বঙ্গ এবং ভুবনেশ্বরের (উড়িষ্যার) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। দণ্ডী তাঁর **কাব্যদর্শে** বৈদর্ভীর

সঙ্গে পূর্বভারতে প্রচলিত গৌড়ী রীতির উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে কলহণের **রাজতরঙ্গিনীতেও** গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

লেখমালায় গৌড় জন বা গৌড় জনপদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম গৌড় জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় মৌখরি রাজ ঈশান বর্মার **হরাহা** লেখতে (খ্রীষ্টীয় ৫৫৪)।[৫] এই লেখতে গৌড় জনপদ ও গৌড় জাতির উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে "গৌড়ান সমূদ্রাস্রয়ান"। গৌড় রাজ পরাজিত হয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। অপর দিকে **গুর্গী** লিপিতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। এর দ্বারা মনে হয়, গৌড়ের সীমানা বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভাস্কর বর্মনের **নিধনপুর** তাম্রশাসনে গৌড়দের পরোক্ষ উল্লেখ আছে।

আদিত্য সেনের **আফসাদ প্রস্তর** লেখতে (৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়দেশের উল্লেখ আছে।[৬] ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, গৌড়ের নিকটে খালিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানেও গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] অমোঘবর্ষের সঞ্জান তাম্রশাসনে ধর্মপালকে গৌড়ের রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] অমোঘবর্ষের **সিরুর ও নেলগুন্ধ** লেখ দুটিতে গৌড় জাতির উল্লেখ আছে।[৯] **বাদাল গরুর** স্তম্ভ লেখতে দেবপালকে গৌড় জনপদের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের দেওলি তাম্রশাসনে গৌড় জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] বৈদ্যদেবের কামরূপ তাম্রশাসনে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে।[১১] লক্ষ্মণসেনের **মাধাইনগর তাম্র-শাসন** এবং Indian Office তাম্রশাসনে গৌড়ের কথা আছে।

(ঘ)

গৌড় জনপদের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন বঙ্গদেশে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে যে জনপদগুলির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়, সেগুলি হল গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, দক্ষিণ রাঢ়া, উত্তর রাঢ়া এবং তাম্রলিপ্ত। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত এই জনপদগুলির পৃথক অস্তিত্ব যেহেতু প্রতীয়মান হয়, গৌড় জনপদের একটি নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করার প্রয়াস এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বরাহমিহিরের **বৃহৎসংহিতায়** বলা হয়েছে, গৌড়দেশ পুণ্ড্র তাম্রলিপ্ত বঙ্গ সমতট এবং বর্ধমান থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু **ভবিষ্যপুরাণ** থেকে আমরা যে তথ্য পাই তা **বৃহৎসংহিতার** সঙ্গে মেলে না। এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, পুণ্ড্রদেশের সাতটি বিভাগের মধ্যে একটি ছিল গৌড়। এই সাতটি বিভাগ হল—

১. গৌড়,
২. বরেন্দ্রী (মালদহ—রাজশাহী-বগুরা অঞ্চল),
৩. নীবিতি (রংপুর),
৪. সুহ্মদেশ (রাঢ়)
৫. ঝাড়িখণ্ড (সাঁওতাল পরগণা জেলা)
৬. বরাহভূমি (বরাভূম মানভূম জেলা),
৭. বর্ধমান।[১২]

ভবিষ্যপুরাণ থেকে আরও জানা যায় যে, গৌড় জনপদ গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত স্থানগুলিকে নিয়ে—

১. নবদ্বীপ (নদীয়া জেলা),
২. শান্তিপুর (নদরী জেলা),
৩. মৌলাপত্তন (হুগলী জেলা),
৪. কণ্টক পত্তন (বর্ধমান জেলার কাটোয়া)

ভবিষ্যপুরাণের এই সাক্ষ্যের সঙ্গে **ত্রিকাণ্ডশেষ** থেকে প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সেখানে বলা হয়েছে যে পুণ্ড্র এবং বরেন্দ্রী অভিন্ন। এবং এই অভিন্ন জনপদটি গৌড়জনপদের অন্তর্ভু ক্ত ছিল। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে **ত্রিকাণ্ডশেষে** যে ট্র্যাডিশান রয়েছে তাকেই অনুসরণ করে **ভবিষ্যপুরাণের** ট্র্যাডিশান গড়ে ওঠে। তবে **ভবিষ্যপুরাণে** খুব সম্ভবতঃ **ত্রিকাণ্ডশেষের** তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যাই হোক এই ট্র্যাডিশানকে যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে বৃহৎসংহিতায় অনেক পরবর্তীকালে গৌড়জনপদের এক বিস্তৃত ভৌগোলিক ধারণা গড়ে উঠেছিল।

উক্ত ট্র্যাডিশান থেকে জানা যায় যে বিহারের অঞ্চলগুলি বাদ দিলে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী জনপদের যে অংশটি থাকে তার থেকে গৌড় স্বতন্ত্র ছিল না। কারন

গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সুহ্ম বা রাঢ় এবং বর্ধমান। অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছিল গৌড় জনপদ। সুহ্মের উল্লেখ থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্তও এই জনপদের বাইরে ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বরাহমিহিরের **বৃহৎসংহিতায়** রাঢ় জনপদকে গৌড় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখানো হয়নি। তবে বঙ্গ সমতট অঞ্চল যে গৌড় জনপদের বাইরে ছিল, এ বিষয়ে **বৃহৎসংহিতা** ও **ভবিষ্যপুরাণের** মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই।

মধ্যযুগে **শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে** বলা হয়েছে যে, গৌড় দেশ বঙ্গ এবং ভুবনেশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।[২৩] এখানে আরও বলা হয়েছে যে, বঙ্গদেশ সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদ্র বলাবাহুল্য বঙ্গোপসাগর। উক্ত বর্ণনা থেকে সংশয়ের অবকাশ খুব কমই যে, সমুদ্রোপকূল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গ-সমতট অঞ্চল গৌড় জনপদের বাইরে ছিল। এখানে যে কথাটি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি তাহল এই যে, ভাগীরথী নদী (হুগলী) সেই সময় একদিকে বঙ্গ সমতট অন্য দিকে গৌড় জনপদের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গকে বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গকে গৌড় বলা হতো। সেই ট্র্যাডিশান মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণেও পাওয়া যায়। সেই কারণে সমগ্র বাংলা দেশকে বোঝাতে গৌড়-বঙ্গ নামটি প্রচলিত হয়েছিল। যাইহোক গৌড়ের দক্ষিণ সীমানা উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার যে তথ্যটি **শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে** পাওয়া যায়, তা সম্ভবতঃ কোন সময়ে গৌড়ের রাজাদের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই বিস্তার ছিল সাময়িক।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চৈনিক পরিব্রাজক—হিউ-এন-সাঙ যখন বঙ্গদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন তিনি সেখানে পাঁচটি জনপদের অস্তিত্ব দেখেছিলেন। সেই পাঁচটি জনপদ হল, কজঙ্গল (রাজমহল), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর) এবং সমতট (ভাগীরথীর পূর্ব তীরস্থ পূর্ববঙ্গ)। যদি আমরা শশাঙ্কের রাজ্য কর্ণসুবর্ণকে মূল গৌড় বলে ধরে নিই, বাণভট্ট তার **হর্ষচরিতে** এবং হিউ-এন-সাঙ তার বিবরণে শশাঙ্ককে "গৌড়াধিপ" বলে উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড় জনপদ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে শশাঙ্কের রাজত্বকালে কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জন-

পদগুলি তাঁর অধিকারে এসেছিল। কাজেই তখন গৌড় জনপদ রাজনৈতিক দিক থেকে সুবিস্তৃত ছিল। তাছাড়া শশাঙ্কের অধিকার উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে সমতট অঞ্চলে তাঁর অধিকার ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। অতএব গৌড়ের উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার ট্র্যাডিশান খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই গড়ে ওঠে।

গৌড়কে তৃতীয় শতকের পূর্বে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অঞ্চল হিসাবে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার **হরাহা** লেখতে মৌখরিদের সাথে গৌড়দের সজ্ঘর্ষ প্রসঙ্গে 'সমুদ্রাশয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলকে বোঝায়।[১৪] মনে করা অযৌক্তিক নয় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গৌড়ের সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং সমুদ্র-নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নৌ-বাণিজ্যে তারা দক্ষ ছিল বলে জানা যায়। যার প্রমাণ হিসাবে রক্তমৃত্তিকা বিহারের মহানাবিক বুধগুপ্ত কর্তৃক মালয়েশিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার কথা বলা যায়।[১৫] এছাড়াও দুটি তাম্রশাসনে গৌড় জাতিকে নৌশক্তিতে বলীয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ গৌড় জনপদ ক্রমশঃ তার সীমানা বিস্তৃত করতে থাকে বিভিন্ন শাসকদের অধীনে। এবং এই সময় রাঢ়, সুহ্ম, বর্ধমান, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদগুলি এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আমরা শশাঙ্কের অধীনে গৌড়কে রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে পাই।

এ পর্যন্ত আমরা **বৃহৎসংহিতা, ভবিষ্যপুরাণ, ত্রিকাণ্ডশেষ, শক্তি-সঙ্গমতন্ত্র** এবং হিউ-এন-সাঙের বিবরণের ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে যুক্তি-সঙ্গত ভাবে ধারণা করা যায় যে, গৌড় জনপদ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রীর কতকাংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ গৌড় নগরীর মূল অবস্থান, ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়েছি, পুণ্ড্রবর্ধন-বরেন্দ্রীর দক্ষিণে-পশ্চিমে এবং গঙ্গার উত্তর তীরে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে যখন গৌড়ের কেন্দ্রবিন্দু গঙ্গার উত্তর তীর থেকে সরে এলো ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই গৌড় জনপদ পুণ্ড্রবর্ধনকে অতিক্রম করে উত্তর রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এবং আরও পরবর্তীকালে গৌড় জনপদের সীমানা বর্ধিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের

উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কখনো কখনো সেই দক্ষিণ সীমানা বিস্তৃত হয়েছে উড়িষ্যার উত্তর ভাগ পর্যন্ত।

অন্যান্য যে সব প্রাচীন জনপদের নাম পাওয়া যায় সেগুলিকে বাংলার মানচিত্রে স্থাপিত করে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে মূলত গৌড় জনপদ তার স্বতন্ত্র নিয়ে কোথায় অবস্থিত ছিল। প্রথমত, বিভিন্ন মূল থেকে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে বঙ্গ জনপদকে স্থাপিত করা হয়েছে গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের পূর্ব ভাগে।[১৬] দ্বিতীয়ত, সমতট অবস্থিত ছিল প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, যার কেন্দ্রে ছিল ত্রিপুরা জেলা।[১৭] তৃতীয়ত, হরিকেলকে শ্রীহট্টের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।[১৮] চতুর্থত, চন্দ্রদ্বীপ মধ্যযুগে বাখারগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ছিল।[১৯] পঞ্চমত, বঙ্গাল জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বঙ্গ জনপদের সেই অংশটি, যেটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এবং এবং যে ভূখণ্ড অসংখ্য খাড়ি দ্বারা পূর্ণ।[২০] ষষ্ঠ, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন বলতে সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকেই বোঝান হয়ে থাকে।[২১] সপ্তম, বগুড়া-রাজশাহী এবং দিনাজপুর নিয়ে গড়ে ওঠা বরেন্দ্রী জনপদ পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যেই ছিল।[২২] অষ্টম, দক্ষিণ রাঢ়াকে সাধারণভাবে উত্তরে অজয় নদ এবং দক্ষিণে দামুদর নদের ভূভাগে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[২৩] নবম, উত্তর রাঢ়া অবস্থিত ছিল দক্ষিণে অজয় এবং উত্তরে গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে।[২৪] দশম, তাম্রলিপ্ত জনপদটি ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কেন্দ্রে অবস্থিত।[২৫] এই জনপদগুলি থেকে যদি গৌড় জনপদকে পৃথক বলে ধরে নিতে হয় তাহলে অনুসন্ধান করতে হয় প্রাচীন গৌড় নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল। কারণ এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে, সেই নগরীকে কেন্দ্র করেই গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল।

এ বিষয় পণ্ডিতদের মতভেদ দেখা দিতে পারে যে গৌড় নগরকে কেন্দ্র করে জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল অথবা গৌড় জনপদের কেন্দ্র হিসাবে গৌড়নগরীর উদ্ভব হয়েছিল।[২৬] আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কালক্রমানুসারে গৌড় নগরীর উল্লেখ আমরা পাই প্রাচীনতর সাহিত্যগত উপাদানে। অপর দিকে গৌড়-দেশ, গৌড় জনপদ অথবা গৌড় রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তুলনায় পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থাদিতে এবং লেখমালায়। অতএব সেই দিক থেকে বিচার করলে স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারণা হয় যে, গৌড় জনপদের

উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন গৌড় নগরীকে কেন্দ্র করে। অবশ্য গৌড় জনপদ যখন বিস্তার লাভ করে তখন তার কেন্দ্রটিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যাইহোক, প্রাচীনতার দিক থেকে বিচার করলে গৌড় জনপদের অবস্থান আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে গঙ্গার তীরস্থ সন্নিহিত অঞ্চলে যেখানে গঙ্গানদী বিহার থেকে রাজমহল পাহাড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। যেহেতু পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচীন গৌড় নগরীর অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে এবং সেই মতভেদের ভিত্তি হল গঙ্গার স্রোতধারার পরিবর্তন সম্পর্কিত একটা সম্ভাবনার ধারণা, সেইহেতু আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রাচীন গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল, গঙ্গার উত্তর এবং দক্ষিণ তীরে। অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণাংশ এবং উত্তর রাঢ়ের কতকাংশ নিয়ে গৌড় জনপদের আবির্ভাব হয়েছিল বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. R.S Sharma, *Material Culture and Social Formation in Ancient India*, Delhi, 1983, pp. 48-49.
২. রাধাগোবিন্দ বসাক, **কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র**, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অধিকরণ, ১ম অধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭০
৩. কে. আর. আয়াঙ্গার অনুবাদিত, **বাৎস্যায়ণের কামসূত্র**, লাহোর, ১৯২১
৪. *Epigraphia Indica*, Vol. XXXII, p. 48.
৫. *Ibid*, Vol. XIV, p. 117.
৬. *Ibid*, Vol. XXVI, pt. 1.
৭. R.C. Majumder, *History of Bengal*, Calcutta, 1971, p. 14.
৮. *Epigraphia Indica*, Vol. XVII, p. 244.
৯. *Ibid*, Vol. II, p. 160
১০. *Ibid*, Vol. V, p. 190
১১. *Ibid*, Vol. II, p. 348.
১২. D.C. Sircar, *Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1961, p. 114.

১৩. Radhakamal Mukherjee, *The Changing Face of Bengal*, 1938, p. 92.

১৪. দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৯

১৫. *Epigraphia Indica*, Vol-XXX, p. 293.

১৬. R.C. Majumder (ed.), *The History of Bengal*, Vol. I. Dacca, 1943, pp. 15-16.

১৭. *Ibid*. p. 17.

১৮. *Ibid*. pp. 17-18.

১৯. *Ibid*. p. 18.

২০. *Ibid*. pp. 18-19.

২১. *Ibid*. p. 20.

২২. *Ibid*. p. 20.

২৩. *Ibid*. p. 21.

২৪. *Ibid*. pp. 21-22.

২৫. *Ibid*. p. 22.

২৬. *Ibid*. pp. 12-15.

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড় রাষ্ট্র

(ক)

ভূমিকা

জনপদকে একটি নির্দিষ্ট জাতির বসতি স্থল বলে চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে থাকে। সম্ভবতঃ "গৌড়" নামে কোন জাতি বসবাস করতো, অবশ্য গৌড় জাতির কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। লেখমালায় যে উল্লেখগুলি পাওয়া গেছে তাতে গৌড় জনপদ ও গৌড় রাষ্ট্র, গৌড়ের রাজনৈতিক শক্তি বা শাসক-গোষ্ঠী এবং 'গৌড়' নামক জনগোষ্ঠী অনেক সময় একাকার হয়ে গেছে। গৌড়ের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে আলাদা করা একটি দুরূহ সমস্যা। তাছাড়া, গৌড় জনপদ যখন রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করলো তখন তার অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল বিভিন্ন জাতি ও জনপদ। প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, এমনকি সুহ্ম পর্যন্ত এই গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কখনো কখনো অঙ্গ ও মগধ নামক মহাজনপদ দুটিও কালক্রমে গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।

গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা কখনো বর্ধিত হয়েছে, আবার কখনো সংকুচিত হয়েছে। যখন বর্ধিত হয়েছে তখন প্রায় সমগ্র বাংলা ও বিহার তার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু যখন সীমিত হয়েছে তখন তা প্রাচীন উত্তর রাঢ় বা পুণ্ড্র জনপদের প্রান্ত দেশে পর্যবসিত হয়েছে। তবে গৌড় রাষ্ট্রনায়কগণ কখনো কখনো "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করে গৌড়ের রাজনৈতিক ঐক্য ঘোষণা করেছেন। তবে সর্বদা সে উপাধি রাজনৈতিক ঐক্যের দ্যোতক মনে করা যায় না। সময় বিশেষে সেই উপাধি ছিল কেবলমাত্র অতীত ঐতিহ্যবাহী। যাই হোক, গৌড় রাষ্ট্রের উত্থান পতনের একটি সমীক্ষা দ্বারা আমরা একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার প্রয়াস পেতে পারি।

(খ)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন : গৌড় রাষ্ট্রের সূচনা

গৌড়ের রাজনৈতিক উত্থানের পশ্চাৎপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা

প্রকট হয়ে ওঠে। তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই সুযোগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সামন্ত রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এই রূপই একটি সামন্ত রাজ্য ছিল উত্তর প্রদেশের মৌখরি রাজা। প্রায় সমসাময়িক কালে গৌড় রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল বলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখমালা থেকে জানা যায়। পাঁচখানি ফরিদপুর তাম্রশাসন ও মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব নামে তিনজন রাজা পরপর শাসন করেছিলেন। উক্ত রাজত্রয়ের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো ভাগীরথীর পূর্বে অবস্থিত ফরিদপুর, পশ্চিমে অবস্থিত বর্ধমানকে কেন্দ্র করে।

বিভিন্ন তথ্য থেকে উক্ত তিনজন রাজার ৫২৫ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার কথা জানা যায়। সমাচারদেবের শাসনকাল (আনুমানিক ৫৮০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও গোপচন্দ্র এবং ধর্মাদিত্য সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকার ধর্মাদিত্যকে এই বংশের প্রথম রাজা এবং তাঁর সময়কাল ৫৩০ থেকে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করেছেন। অনেক পণ্ডিত গোপচন্দ্রকে এই বংশের প্রথম রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশান বর্মনের **হরাহা** লেখে (৫৫৪ খ্রীঃ) দাবী করা হয়েছে যে, মৌখরিরাজ গৌড়দের পরাজিত করে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে (গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়ান) বাধ্য করেছিলেন। অপর দিকে, গোপচন্দ্রের ফরিদপুর, জয়রামপুর এবং মল্লসারুল লেখ থেকে সমসাময়িক কালে তাঁর স্বাধীন অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[১] যুক্তিসঙ্গতভাবে গোপচন্দ্রকেই গৌড়দের প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে, মনে করা যেতে পারে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ধমানভুক্তিকে কেন্দ্র করে গৌড় রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই সময়ে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, যার প্রমাণ হিসাবে গোপচন্দ্রের প্রথম রাজ্যবর্ষের বালেশ্বর জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করা যায়।[২]

(গ)

গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

শশাঙ্ক প্রথম 'গৌড়াধিপ' উপাধিটি গ্রহণ করেন। মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, তিনিই ছিলেন গৌড় রাষ্ট্রের সংস্থাপক (আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

তিনি কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে (হিউ-এন-সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী) বাংলা ও বিহারের উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন।

কর্ণসুবর্ণের অবস্থান এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে কর্ণসুবর্ণ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল।[৩] এই কারণে প্রাচীন গৌড় নগরীকে তাঁরা কর্ণসুবর্ণ বলে মনে করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত-এ (সি-য়ু-কি) বলেছেন যে, এই নগরের দৈর্ঘ্য ছিল ২০ লি এবং এটি ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে দু'মাইল অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল। তা'ছাড়া. মুর্শিদাবাদ জেলায় 'রাজবাড়ী ডাঙ্গায়' খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত সীল থেকে "রক্ত-মৃত্তিকা মহাবিহারের" সন্ধান মেলে। তার ভিত্তিতে অনুমান করা সঙ্গত যে, মুর্শিদাবাদে রাঙ্গামাটিতে শশাঙ্কের রাজধানী অবস্থিত ছিল।[৪] তা হলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে গৌড় রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্র অবস্থিত ছিল ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে, বর্ধমানের উত্তরে। হিউ-এন-সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।

শশাঙ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কিত তথ্য যে সকল উপাদান থেকে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রথম রোতাসগড় দুর্গপ্রাকারে উৎকীর্ণ "মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের" সীলমোহরের ছাঁচ।[৫] মনে হয়, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় বিহারের একজন সামন্ত হিসাবে। শশাঙ্কের সময় তাঁর অধীনস্থ সামন্ত শুভকীর্তি এবং সোমদত্ত উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় মেদিনীপুর তাম্রশাসনে।[৬] এছাড়া তাঁর সামন্ত দ্বিতীয় মাধববর্মার গঞ্জাম তাম্রশাসনটিও (৬১৯ রাজ্য বর্ষ) উল্লেখযোগ্য। এই তাম্রশাসনটি শশাঙ্কের সময়ে উড়িষ্যায় গৌড়ের রাজনৈতিক আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান খড়্গপুরের নিকটে প্রাপ্ত এগরা তাম্রশাসনটিও তাঁর শাসনকালের।

বাণভট্টের **হর্ষচরিত** এবং হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, শশাঙ্ক তাঁর রাজত্বের প্রাথমিক পর্বে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে গৌড়কে যুক্ত করেছিলেন। থানেশ্বর-মালব দ্বন্দ্বে শশাঙ্ক মালব-রাজ দেবগুপ্তের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। কান্যকুব্জ পর্যন্ত শশাঙ্কের বিনা বাধায় অগ্রগতির ভিত্তিতে আমরা সংগত কারণেই মনে করতে পারি যে, বিহার থেকে কান্যকুব্জ পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তরভারতে সাময়িক কালের জন্য গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। থানেশ্বর-কামরূপ জোট শশাঙ্কের তথা গৌড়-

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতে বিফল-মনোরথ হয়েছিল। হর্ষবর্ধন ৬০৬ থেকে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'পঞ্চভারত' জয়ের দাবী করলেও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার কোনও অংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, যতদিন শশাঙ্ক গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন। বৌদ্ধ **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে** হর্ষ-শশাঙ্কের শক্তি পরীক্ষার বিবরণ রয়েছে। দুবী তাম্রশাসনে সম্ভবতঃ তদানীন্তন কামরূপরাজের সঙ্গে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড়ে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন শশাঙ্কের মৃত্যুর পর। অতএব, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত গৌড় রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

(ঘ)

শশাঙ্কোত্তর গৌড়

শশাঙ্ক যে শক্তিশালী গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্রমশঃ ভাঙ্গন দেখা যায়। তারানাথের বিবরণ, হিউ-এন-সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ও **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প** থেকে শশাঙ্কোত্তর ও প্রাক্-পাল পর্বে গৌড়ের কথা জানা যায়।[৭] **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে** বলা হয়েছে, রাজা সোমের (শশাঙ্কের) পর গৌড়ের যে সকল রাজারা রাজত্ব করেন তাঁরা কেউ এক বৎসর, কেউ কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। অপর দিকে হিউ-এন-সাঙ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণকালে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ এবং কজঙ্গল এই পাঁচটি বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্যটি প্রমাণ করে যে, তৎকালে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল।

যশোবর্মন কান্যকুব্জ অধিকার করেন, এই তথ্য তাঁর সভাকবি বাকপতিরাজের **গৌড়বহো** নামক প্রাকৃত কাব্য থেকে জানা যায়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যশোবর্মন কর্তৃক গৌড়াধিপ পরাজিত হন।[৮] গৌড়পতি এবং মগধনাথকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনে হয় তাঁরা অভিন্ন এবং এই গৌড়াধিপ কে, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যদি তিনি মূলত মগধের রাজা হন, তবে তাঁকে পরবর্তী গুপ্ত-রাজবংশের দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলে ধরে নিতে হয়। আর যদি তিনি মূলত গৌড়ের রাজা হন, তবে তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের তদানীন্তন শৈলবংশের নরপতি হতে পারেন।

যশোবর্মন কর্তৃক গৌড় বিজয় বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি, কারন ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের নিকট তিনি উত্তরভারতে তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্য হারান। কলহণের **রাজতরঙ্গিণী** থেকে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কর্তৃক কান্যকুব্জ জয়ের কথা জানা যায়। আরও বলা হয়েছে যে, কাশ্মীর রাজের নিকট গৌড়রাজ পরাজিত হন এবং তাঁর কূট-কৌশলে গৌড়পতি কাশ্মীরে গিয়ে নিহত হন।[১০] পরবর্তীকালে কামরূপের ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষদেব গৌড়ের প্রভুত্ব দাবী করেন।[১১] নেপালরাজ জয়দেবের ১৫০ সম্বতে (৭৫৮ খ্রীঃ) পশুপতিনাথ মন্দির লেখ থেকে এই তথ্য জানা যায়। রাজতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে যে, ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পঞ্চগৌড় জয় করে পুণ্ড্রবর্ধনের তদানীন্তন অধিপতি জয়ন্তকে তার প্রভুত্ব দান করেন। সম্ভবতঃ এখানে পঞ্চগৌড় বলতে গৌড় রাষ্ট্রেরই পাঁচটি বিভাগকে বোঝান হয়েছে। অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের পটভূমিকায় পঞ্চগৌড়ের অস্তিত্ব গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অনৈক্যকে সূচিত করে। গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পাঁচটি রাজ্যকে কলহণ পঞ্চগৌড় বলে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়।

(৬)

পালযুগে গৌড় রাষ্ট্রের উত্থান-পতন

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ 'মাৎস্যন্যায়' এর অবসান ঘটিয়ে গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে বসেন এবং এই ঘটনার মাধ্যমে নূতন রাজবংশ, পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পালবংশের অধীনে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বারংবার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়েছিল। গোপালের পিতৃভূমি কোথায় ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন যে গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গালে রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন। এবং মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে গৌড় বঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে আবদুল মমিন চৌধুরী মনে করেন যে পালদের অভ্যুত্থান হয়েছিল উত্তর ও উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ও মগধে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে নয়।[১২] কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে দাবী করা হয়েছে যে গোপাল সমুদ্র পর্যন্ত দিগ্বিজয় করেছিলেন। কিন্তু বরেন্দ্রীতে যদি তিনি ক্ষমতায় এসে থাকেন তাহলে সুদূর বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত দিগ্বিজয়

কিন্তু যদি বঙ্গাল জনপদে ক্ষমতাসীন হয়ে
করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অদূরবর্তী সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া কোন
থাকেন তবে তাঁর পক্ষে অদূরবর্তী সমুদ্র তাছাড়া **তারানাথের বিবরণ** থেকেও
মতেই অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া গোপাল বঙ্গাল জনপদে সর্বপ্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হন।
স্পষ্টই জানা যায় যে গোপাল বঙ্গাল জনপদে সর্বপ্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হন।
ধর্মপালের **খালিমপুর লেখ** এবং তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায় যে,
গোপাল প্রজাদের (প্রকৃতিভিঃ) দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপাল বঙ্গাল
জনপদের রাজা হলেও তিনি তাঁর পিতৃভূমি পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রীর সঙ্গে সংযোগ
বিচ্ছিন্ন করেন নি বলে মনে হয়। বস্তুতপক্ষে তিনি বঙ্গ-বঙ্গাল জনপদে গৌড়
থেকে আগত এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন। অতএব তাঁর ক্ষমতায় আসীন
হওয়া গৌড়ের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সূচক হয়ে উঠেছিল।

ভাগলপুর এবং **খালিমপুর** তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে গোপালের পর ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। অমোঘবর্ষের সঞ্জান তাম্রশাসনে ধর্মপাল প্রসঙ্গে রাজ্ঞঃ (গৌড়ম)[১৩] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতে বলা যায় যে ধর্মপাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গৌড়ের রাজা বলে সমসাময়িক শাসক গোষ্ঠীদের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ধর্মপাল তাঁর রাজত্বকালে (৭৭০-৮১০) গঙ্গানদীর সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলে তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কনৌজকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুযায়ী ভোজ, মৎস, বদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা কনৌজের দরবারে এসে ধর্মপালের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।[১৪] রাজপুতানা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মালব এবং কাংড়া অঞ্চলে এই রাজ্যগুলি অবস্থিত ছিল। অবশ্য, ধর্মপাল চক্রায়ুধকে তাঁর মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন।[১৫] ধর্মপালের এই উজ্জ্বলতম রাজনৈতিক সাফল্য এসেছিল পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট ত্রিদলীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

সুতরাং, উত্তর ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গৌড়াধিপত্য স্থাপিত হয়। গুজরাটি কবি সোড়ল তার **উদয়সুন্দরীকথা** নামক কাব্যে তাঁকে উত্তরাপথস্বামী বলে অভিহিত করেছেন।

বলা যেতে পারে, ধর্মপাল গৌড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর

রাজধানী ছিল অবশ্য পাটলিপুত্রে (জয়স্কন্ধাবার), এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বরেন্দ্রের অন্তর্গত করঞ্চ গ্রাম তিনি স্বর্ণবেন ব্রাহ্মণকে দান করেন।[১৬] অতএব সামরিক কারণে পাটলিপুত্র তাঁর অন্যতম শাসনকেন্দ্র হলেও তাঁর সামরিক ভিন্ন অন্য কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী। অতএব সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে গৌড় ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের আর একটি কেন্দ্র। ধর্মপালের সাম্রাজ্যের গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর মূল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুর্ক্ত ছিল বঙ্গ ও বিহার, কান্যকুব্জ ছিল তাঁর অধীন ও সামন্ত রাজ্য এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য যে সব রাজ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল সেগুলি ছিল করদ রাজ্য। অতএব তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বঙ্গ ও বিহারকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন গৌড়।

পরবর্তী পালবংশের রাজা দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে বঙ্গ, বিহার অর্থাৎ গৌড়ের অধিকার পেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও গৌড়ের কেন্দ্র মগধ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। দেবপালের অধিকাংশ লেখ (কুর্কীহার, নালন্দা, ঘোষবারা, মুঙ্গের) মগধ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়। বাদাল প্রশস্তি অনুযায়ী দেবপালের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত।

দেবপালের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুভূত হয়, যখন দিনাজপুরে প্রাপ্ত বাদাল স্তম্ভ লেখে দেখা যায়, পালরাজ উৎকলদের উন্মূলিত করেন, হূণদের গর্ব খর্ব করেন, দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথ-এর দর্প নাশ করেন। অতএব, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তরভারতীয় রাজনীতিতে গৌড়ের একাধিপত্য স্বীকৃত হয়। অনুমান করা যেতে পারে, দেবপালের আমলেও পাটলিপুত্রই ছিল গৌড় সাম্রাজ্যের কেন্দ্র।

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় আমরা দেখেছি **'গৌড়বহো'** কাব্যে মগধনাথ ও গৌড়াধিপের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এক শতাব্দীকাল সেই একই ঐতিহ্য বজায় ছিল। ধর্মপাল ও দেবপাল একাধারে মগধনাথ ও গৌড়াধিপ ছিলেন। অবশ্য, প্রতীহাররাজ মিহিরভোজের গোয়ালীয় প্রশস্তিতে ধর্মপালকে **'বঙ্গপতি'** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই লেখতে দেবপালকে **ধর্মাপত্য** বা ধর্মপালের পুত্র

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমিত হতে পারে যে, দেবপালও, তাঁর পিতা ধর্মপালের মত প্রতীহারদের নিকট **বঙ্গপতি** বলেই পরিচিত ছিলেন। অতএব, খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গৌড় ও বঙ্গ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেবপালের পর থেকে মহীপালের পূর্ব পর্যন্ত (৮৫০-৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ দেখা যায়। গৌড়ের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বলতে এই সময় কিছুই ছিল না, পালবংশের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়কার চন্দেল্ল এবং কলচুরি লেখগুলি থেকে বোঝা যায় এই সময় গৌড়ের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল এবং গৌড় রাষ্ট্র তখন কয়েকটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। কলচুরি ও চন্দেল্ল লেখমালায় গৌড়, বঙ্গাল (বঙ্গ) রাঢ়া, অঙ্গ প্রভৃতি পৃথকভাবে কলচুরিদের বিলহারি লেখতে গৌড় ও গোহারওয়া লেখতে বঙ্গাল উল্লেখিত। চন্দেল্লদের খাজুরাহ লেখতে গৌড় ও রাঢ় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দশম শতকের সপ্তম দশক পর্যন্ত গৌড় সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটেছিল এবং মূল গৌড় রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই সময় পালরা কোন রকমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল মগধে। বঙ্গ সমতট অঞ্চল চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধিকারে চলে যায় এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থাকে, যাকে মূল গৌড় রাষ্ট্র বা জনপদ বলে স্বীকার করা হতো, তা কম্বোজদের অধিকারে চলে যায়। অতএব গৌড় ও মগধ নিয়ে যে মগধ রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তা এই সময় ভেঙ্গে যায়। এবং গৌড় ও মগধ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই পটভূমিতে প্রথম মহীপাল (৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) সিংহাসন লাভ করেন। মহীপালের সারনাথ লেখতে তাঁকে গৌড়াধিপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] বাণগড় তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, মহীপাল কম্বোজদের বিতাড়িত করে তাঁর পিতৃভূমি বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন।[১৮] রাজেন্দ্র চোলের তিরুবালঙ্গাড়ু তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়ের রাজা হিসাবে প্রথম মহীপালের নাম পাওয়া যায়। একই সঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গালে গোবিন্দচন্দ্র এবং দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপালের নাম শাসক হিসাবে উল্লেখিত।[১৯] প্রথম মহীপালের আমলের লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান ছিল সারনাথ, বাঘাউরা, নারায়ণপুর, দ্বারভাঙ্গা, বেলোয়া, বোধগয়া, কুর্কীহার, নালন্দা, ইমাদপুর ও তেত্রাবন। এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, মহীপালের রাজ্যে

উত্তর রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ ও বারাণসী অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, বারাণসীর উপর মহীপালের অধিকার স্থায়ী হয় নি। তবু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সমগ্র বাংলা-বিহার নিয়ে মহীপাল তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মপাল ও দেবপালের ঐতিহ্যানুযায়ী আবার গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর 'গৌড়াধিপ' উপাধি সার্থক এই কারণে যে, তিনি এবার পূর্বের ন্যায় মগধকে কেন্দ্র করে নয়, গৌড়কে কেন্দ্র করেই গৌড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। কারণ, তাঁর রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র ছিল উত্তর রাঢ় ও বরেন্দ্রী।

প্রথম মহীপালের পর থেকে রামপালের পূর্ব পর্যন্ত (১০৩৮-১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) সময়কালে গৌড়ের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অধীনস্থ সামন্তরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। কলচুরিদের লেখমালা (ভেরাঘাট, করণবেল ও রেওয়া লেখ) থেকে জানা যায়, নয়পালের রাজত্বকালের লক্ষ্মীকর্ণের সমর অভিযানের সময় গৌড় ও বঙ্গ দুটি পৃথক রাষ্ট্র ছিল। আবার, উড়িষ্যার সোমবংশী রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতির সোনপুর শাসনে গৌড় ও রাঢ়কে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, এই সময়ে গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা পুণ্ড্রবর্ধনে বা বরেন্দ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। তাঁর গৌড় অভিযানের বর্ণনা রয়েছে বিল্হণের **বিক্রমাঙ্কদেব** চরিতে। কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে পালদের পিতৃভূমি (জনকভূঃ) বরেন্দ্রী স্বাধীন রাজ্য হয়ে যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত** থেকে জানা যায়, স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন তিনজন কৈবর্ত —দিব্য, রুদোক ও ভীম। সামন্ত চক্রের সহায়তায় রামপাল (১০৭৭-১১২০) ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন[20] এবং রামাবতী নগরীতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

রামাবতী নগরী গঙ্গা এবং করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিতে রামাবতীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, রামাবতী পালদের পতন পর্যন্ত তাঁদের রাজধানী ছিল। মনহলি লেখতে আছে "শ্রীরামাবতীনগর-পরিসর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"।[২১] রামাবতী নগরীর স্মৃতি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বজায় ছিল। কারণ, আবুল ফজলের **আইন-ই-আকবরীতে** রমৌতি'র উল্লেখ পাওয়া যায় (রামাবতীকে পার্সি ভাষায় রমৌতি বলা হয়েছে)।[২২]

রামপালের রাজত্বকালের মগধে অধিকার বিস্তারের নীতি পরিত্যক্ত হয়। তিনি কামরূপ, পূর্ববঙ্গ ও উৎকলে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। তাঁর বংশধরদের আমলে (১১২০-১১৫৫) পালদের পতন ঘনিয়ে আসে। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে রামপালের পুত্র কুমারপালের উপাধি **গৌড়েশ্বর** উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর সময়ে কামরূপের সামন্ত রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ব বাংলায় বর্মন রাজারা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য দাবী করেন। শেষ রাজা মদনপাল বিজয়সেনের দ্বারা পরাজিত হয়ে মগধে আশ্রয় নেন। মদনপাল দেওপাড়া প্রশস্তিতে গৌড়েন্দ্র বলে উল্লেখিত হয়েছেন।[২৩]

(চ)

সেন আমলে গৌড় রাষ্ট্র

সেন বংশের প্রথম রাজা সামন্ত সেন। সম্ভবতঃ পালদের অধীনে রাঢ় অঞ্চলে একজন সামন্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন প্রথম "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করেন। দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে জানা যায়, তিনি রাজাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন।[২৪] সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে হেমন্ত সেন সুরপাল ও রামপালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মনে হয়, পাল রাজকুমারদ্বয় গৌড় থেকে পালিয়ে এসে রাঢ়াতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পালদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের পতন হয়েছিল বটে, কিন্তু বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮) পুনরায় গৌড়ের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বিজয়সেন উত্তরবঙ্গে রাজশাহীর অন্তর্গত দেওপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির ও তাঁর রাজধানী বিজয়পুর প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ধোয়ীর **পবনদূতের** বর্ণনা অনুযায়ী বিজয়পুরের অবস্থান হওয়া উচিত নদীয়ায়। সম্ভবতঃ, লক্ষ্মণসেনের আমলে নদীয়ায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হলে পূর্ববর্তী বিজয়পুরের নামানুসারে তার নাম হয় বিজয়পুর। এ বিষয়ে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, বিজয়সেন পালদের ক্ষমতার কেন্দ্র গৌড় জয় করে—সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করবেন। ততদিন সেনরা রাঢ়াতেই অবস্থান করছিলেন। গৌড় জয়ের পরও তাঁরা সেখানেই অবস্থান করবেন, বর্তমান নদীয়াকে কেন্দ্র করে, এই তথ্য যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। রামাবতী

থেকে পালদের উৎখাত করে তার সন্নিকটে বিজয়পুর প্রতিষ্ঠা করা ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। বিজয়সেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন নি। তাঁর পূর্ববর্তী পাল রাজারা, যাঁরা গৌড়াধিপ ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন নি। পাল সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ, সেই সময় কুমার পালের নামের সঙ্গে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি যুক্ত হতে দেখা যায়।

যাইহোক, দেওপাড়া প্রশস্তি[২৫] থেকে জানা যায়, নান্য (মিথিলার রাজা), বীর (কোটাটবীয় বীরগুণ, যাঁর নাম **রামচরিতে** আছে), রাঘব (কলিঙ্গাধিপতি), বর্ধন (কৌলম্বীর দ্বোরপবর্ধন, যাঁর নাম রামচরিতে আছে) এবং কামরূপের রাজা (সম্ভবতঃ কমৌলী তাম্রশাসনের বৈদ্যদেব) বিজয় সেনের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। বিজয়সেনের রাজত্বকালের দেওপাড়া প্রশস্তি, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন ও পাইকোড় লেখের সাক্ষ্যে বলা যায়, গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ়া তাঁর অধিকারে এসেছিল এবং গৌড়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমগ্র প্রাচীন বঙ্গদেশে। তাছাড়া, বিজয়সেনের সামরিক বলে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল মিথিলা (উত্তর বিহার), কামরূপ (আসাম) ও কলিঙ্গে (উড়িষ্যা)।

বল্লালসেন (১১৫৮-১১৬৯) গৌড়ে 'বল্লালভিটা' নামক স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই ভিটাটি বর্তমানে গৌড়ের নিকট সাদুল্লাপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে নবদ্বীপে মায়াপুরের নিকট 'বল্লালভিটার' অবস্থান অনেকে নির্দেশ করেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেনের আমলে তাঁর শাসনকেন্দ্র দুই জায়গাতেই ছিল, গৌড়ে ও রাঢ়ে। **অদ্ভুতসাগরে** বলা হয়েছে, বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বরের' বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উপাধিটির সার্থকতা না থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দপাল নামে মগধের একজন শাসক তার ঐতিহ্য বহন করে চলছিলেন। **বল্লালচরিতে** বল্লালসেনের মগধ অভিযানের কথা বলা হয়েছে। বল্লালচরিতের ট্র্যাডিশান অনুযায়ী উক্ত সেন রাজার অধিকারে ছিল বঙ্গ, বরেন্দ্রী, রাঢ়া বাগড়ি (রাঢ়া ও উৎকলের মধ্যবর্তী) ও মিথিলা। মনে হয়, বল্লালসেনের রাজত্বকালে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গৌড়ের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল।

মাধাইনগর তাম্রশাসনে শ্লোক ১৯ এবং শ্লোক ৩২শে লক্ষ্মণসেনকে গৌড়েশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] লক্ষ্মণসেনের সময়ে (১১৬৯ থেকে ১২০৬ খ্রীঃ)

গৌড়ের নূতন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থাপন করা হয়। মিন্‌হাজউদ্দিন এই নগরীকে 'লখনৌতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী 'লখনৌতি' অবস্থিত ছিল 'রালা' (রাঢ়া) ও 'বারিন্দ' (বরেন্দ্র) এর মধ্যস্থলে। মনে হয়, বর্তমানে মালদহ জেলায় যেখানে মধ্যযুগের গৌড় অবস্থিত, সেখানেই ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতী অবস্থিত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের একখানি জৈনগ্রন্থ থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণসেনের মূল শাসনকেন্দ্র ছিল লক্ষ্মণাবতীতে।[২৬] আবার, মিন্‌হাজউদ্দিনের বিবরণ থেকে মনে হয়, নদীয়ায় ছিল দ্বিতীয় রাজধানী।

গৌড়রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মণসেন যে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় উমাপতিধর ও শরণের শ্লোকে, লক্ষ্মণসেন ও তাঁর বংশধরদের লেখমালায়। দাবী করা হয়েছে, সেনরাজ জয় করেছিলেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, মগধ ও কাশী এবং পরাজিত করেছিলেন চেদিরাজ ও ম্লেচ্ছ শাসককে। বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেনের লেখগুলিতে দাবী করা হয়েছে, লক্ষ্মণসেনের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়েছিল পুরী, বারাণসী ও এলাহাবাদে।

লক্ষ্মণসেন যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে জানা যায়, তাঁর দিগ্বিজয়ের অধিকাংশই তিনি যুবক রাজকুমার রূপে বিজয়সেনের রাজত্ব-কালে করেছিলেন। যেহেতু দেওপাড়া প্রশস্তিতে বারাণসী, প্রয়াগ ও পুরীর উল্লেখ নেই, অনুমান করা যেতে পারে লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজত্বকালে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। চেদি ও ম্লেচ্ছ শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক সাফল্যের কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। যাই হোক, উত্তর ও পূর্বভারতে গৌড়ের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি লক্ষ্মণসেনের বিশেষ অবদান।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের ভূমিদান-পট্টোলিগুলি থেকে গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভুক্তিগুলির নাম পাওয়া যায় ; পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি (মাধাইনগর, সুন্দরবন, তর্পনদীঘি ও আনুলিয়া তাম্রশাসন), বর্ধমানভুক্তি (গোবিন্দপুর তাম্রশাসন), কঙ্কগ্রামভুক্তি, (শক্তিপুর তাম্রশাসন)।[২৭] পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ছিল বৃহত্তম, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর-রাঢ়া ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডল। কঙ্কগ্রামভুক্তি উত্তর-রাঢ়া ও তৎসংলগ্ন ভূখণ্ড নিয়ে বর্ধমানভুক্তির উত্তরে অবস্থিত ছিল।[২৮]

মিন্‌হাজউদ্দিনের তবকাৎ-ই-নাসিরী থেকে জানা যায় যে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বকতিয়ার খলজি সসৈন্যে নদীয়া আক্রমণ ও অধিকার করেন। পরে তিনি উত্তরে অগ্রসর হয়ে লক্ষৌতি বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। এই ভাবে সমগ্র গৌড় রাষ্ট্র তাঁর পদানত হয়। নদীয়ার পতনের পর লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে চলে যান এবং **সদুক্তিকর্ণামৃতের** সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন (সূর্যসেন) প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের মদনপাড়া মধ্যপাড়া (কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ) এবং ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁরা গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করতেন। অথচ তাঁদের অধিকারে গৌড়ের কোন অংশই ছিল না। তাঁদের অধিকার ভাগীরথীর পূর্বতীরে বঙ্গ-সমতট জনপদে সীমাবদ্ধ ছিল। এ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাঁদের গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণের সার্থকতা কোথায়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এই উপাধি ধারণের মধ্যে অতীত গৌরবের ঐতিহ্য বহন করা ছাড়া আর কোন সার্থকতা ছিল না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মদনপাড়া, সাহিত্য পরিষৎ এবং ইদিলপুর তাম্রশাসন যথাক্রমে ফরিদপুর ঢাকা এবং ফরিদপুরে আবিষ্কৃত হলেও এই তিনখানি তাম্রশাসনে যে ভূমি দানের কথা বলা হয়েছে সেই ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে অবস্থিত ছিল। আমরা উক্ত যুগ থেকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল পর্যন্ত দেখলাম যে গৌড়রাষ্ট্রে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম শাসন বিভাগ। সেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে যাঁরা ভূমি দান করেছিলেন তাঁরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই গৌড়েশ্বর উপাধির ঐতিহ্যকে অনেকাংশে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, যার বিস্তার ছিল পুণ্ড্রবর্ধন থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত, পূর্বে পশ্চিমে তার বিস্তার ছিল ভাগীরথীর দুই তীরে। অর্থাৎ গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি জনপদের অবস্থান ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে। পাল ও সেন যুগের লেখমালায় ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ বঙ্গ সমতট অঞ্চলের কোন পৃথক ভুক্তি বা শাসন বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব এই দিক থেকে বিচার করলে লক্ষ্মণসেনের বংশধরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধিকার নিয়েই গৌড়েশ্বর উপাধির সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অবশ্য সেই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ অংশটি সে সময় মুসলিম অধিকারে চলে গিয়েছিল। যাইহোক, অর্ধ শতাব্দীকাল বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ঢাকা

ফরিদপুর অঞ্চলে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন, এই তথ্য মিন্‌হাজউদ্দিনের বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ লেখমালা এবং অংশত সমসাময়িক সাহিত্য থেকে বিস্তৃত উপাদানাদির আলোকে গৌড়রাষ্ট্রের ইতিহাসের যে রূপ-রেখা উপস্থাপিত হল, তার থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্তে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও ভাঙ্গনের সুযোগে পুণ্ড্রবর্ধনকে কেন্দ্র করে গৌড় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রথম সূচনা আভাষিত হয়। এই সূচনা হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উপরিক মহারাজাদের ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধির ফলে। অবশ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণার সেই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাঢ়া ও বঙ্গ জনপদকে অন্তর্ভুক্ত করে যে স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে এবং যার অস্তিত্ব বজায় ছিল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত, সমসাময়িক কালে উত্তর ভারতে তাকেই গৌড় রাজ্য বলে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধনে যে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, রাঢ় বঙ্গে সেই প্রয়াস অংশত সার্থক হল।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাণভট্টের ভাষায় **গৌড়ভুজঙ্গ** শশাঙ্কের আধিপত্যে কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে গৌড় রাষ্ট্র প্রথম প্রতিষ্ঠা পেল। গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা তখন উত্তরে গঙ্গা থেকে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে বৈতরণী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর পূর্ব সীমা ছিল ভাগীরথী নদী। গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায়ই হল না শুধু, উত্তর ভারতীয় কনৌজ কেন্দ্রীক রাজনীতিতে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃতও হল।

চতুর্থত, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের** ভাষায় গৌড়তন্ত্র অরাজকতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জিত হলেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গৌড়ের স্বীকৃতি অব্যাহত ছিল। তার প্রমাণ মেলে বাকপতি রাজের **গৌড়বহো** এবং কলহণের **রাজতরঙ্গিণীতে**। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড় ও মগধের সমন্বয়ে গৌড় রাষ্ট্রের নবতর রূপ বিকশিত হতে দেখা যায়। তার ইঙ্গিত দিয়েছেন বাকপতিরাজ, যখন তিনি গৌড়াধিপ এবং মগধনাথকে অভিন্ন দেখিয়েছেন। অবশ্য কলহণের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রাক্-পাল পর্বে গৌড়ের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল।

পঞ্চমত, পালযুগে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌড় মগধকে সমন্বিত করে গৌড় রাষ্ট্রের রূপদান করা হয়। এবং যেহেতু বঙ্গাল বা বঙ্গ জনপদে পালদের অভ্যুদয় ঘটেছিল সেকারণে গৌড় ও বঙ্গ সমার্থক হয়ে যায়। তাই পালরাজারা যখন রাষ্ট্রকূটদের নিকট গৌড়াধিপ স্বীকৃত তখন প্রতীহারদের নিকট তাঁরা বঙ্গপতি বলে পরিচিত, গৌড় রাষ্ট্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছিল। এই যুগে গৌড় রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র।

ষষ্ঠত, পালযুগে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত গৌড় রাষ্ট্রে শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার ফলে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। এবং গৌড়ের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক চন্দেল্ল ও কলচুরি লেখগুলি থেকে, যেখানে গৌড় রাঢ়া বঙ্গাল পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ে গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা সংকুচিত হয়ে ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করেছিল। অবশেষে প্রথম মহীপালের রাজত্বের প্রাক্‌কালে গৌড়কে আমরা দেখি উত্তর রাঢ়া দক্ষিণ রাঢ়া দণ্ডভুক্তি ও বঙ্গাল জনপদে বিভক্ত। এই তথ্য চোলদের লেখ থেকে জানা যায়।

সপ্তমত, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে একাদশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত গৌড় রাষ্ট্রের পুনর্-অভ্যুত্থানের কাল। গৌড় রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রথম মহীপালের অবদান সমসাময়িক কালের লেখ মালায় বিধৃত হয়ে আছে। এই সময় থেকে পালদের নীতিতে পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তাঁরা গৌড়কে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেয়েও গৌড় রাষ্ট্রটিকে অটুট রাখার দিকে অধিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বাণগড় লেখ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পালরা তাঁদের পিতৃভূমি বরেন্দ্রীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছিলেন। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তখন থেকে বরেন্দ্রী বা পুণ্ড্রবর্ধনই ছিল পালদের প্রধান শাসনকেন্দ্র। পূর্ববর্তীকালে মগধকে কেন্দ্র করে যে গৌড় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা এই সময় থেকে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়।

অষ্টমত, প্রথম মহীপাল-এর কালে অর্থাৎ ১০৩৮ থেকে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাল শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে অধীনস্থ সামন্তরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। গৌড় রাষ্ট্রের সীমানাও ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে যায়। এই

জয়বর্মার কলচুরি লেখ এবং উড়িষ্যার সোমবংশীয় শাসকের লেখ থেকে জানা যায়, গৌড় রাঢ়া এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল পরস্পর থেকে। তাছাড়া বরেন্দ্রীতে কৈবর্ত বিদ্রোহ পালদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল।

নবম, সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিতের** নায়ক রামপাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে গৌড় রাষ্ট্রের পুনরভ্যুদয়কে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর এই কাজে অবশ্যই তাঁর সামন্ত শ্রেণী বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বরেন্দ্রীতে প্রতিষ্ঠিত পালদের রাজধানী রামাবতীকে কেন্দ্র করে গৌড় রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল কামরূপ, উৎকল এবং বঙ্গ সমতট অঞ্চলে। গৌড় রাষ্ট্র-এর শক্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে—চোল চালুক্য গাড়হবাল প্রভৃতি রাজনৈতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত গৌড়ের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেনি।

দশম, খ্রীষ্টীয় ১১২০-১১৫৫ সময়কালের রামপালের বংশধরদের আমলে যখন গৌড় রাষ্ট্রের পতন আসন্ন সেই সময় পাল রাজারা গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করতে শুরু করেন। কুমার পাল 'গৌড়েশ্বর' আর মদন পাল 'গৌড়েন্দ্র'। মনে হয় বিলীয়মান গৌড়ের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার এটি শেষ চেষ্টা। এমন কি যখন পালরা গৌড় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মগধে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তখনও তাঁরা গৌড়েশ্বর উপাধিটি বহন করে চলেছিল। কিন্তু পালদের পতন ঘটলেও গৌড়ের পতন ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। গৌড় রাষ্ট্রের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেনরা। ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল গৌড় রাষ্ট্রে।

একাদশ, সেনবংশের রাজা বিজয়সেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর রাজধানী বিজয়পুরকে কেন্দ্র করে গৌড় বঙ্গ ও রাঢ়াকে একই শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সেনযুগে গৌড় বলতে সমগ্র প্রাচীন বাংলাদেশকে বোঝাতো। বিজয়সেনের উত্তরাধিকারী হিসাবে বল্লালসেন সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু সেন রাজাদের মধ্যে প্রথম গৌড়েশ্বর উপাধিধারী লক্ষ্মণসেন গৌড় রাষ্ট্রের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর দিগ্বিজয়ী বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন একদিকে পুরী অন্যদিকে বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত। কামরূপ কলিঙ্গ ও মগধে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের যে প্রয়াস বিজয়সেনের সময়ে শুরু হয়েছিল লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তা অব্যাহত ছিল। এই সময় লক্ষ্মণাবতী ও নদীয়া ছিল গৌড় রাষ্ট্রের দুই রাজধানী।

দ্বাদশ, মুসলমান আক্রমণের ফলে গৌড় রাষ্ট্রের পতন হয়নি, সেন শক্তির

অবনতি ঘটেছিল। বখতিয়ার খলজি গৌড় রাষ্ট্রে সেনদের দুইটি শক্তিকেন্দ্র নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী (লক্ষ্ণৌতি) জয় করে তাঁর গৌড় জয় সম্পূর্ণ করেছিলেন। এর ফলে গৌড় রাষ্ট্রে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে সেনরা পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে ভূমিদান ও গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণের দ্বারা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন যে তাঁরাই গৌড় রাষ্ট্রেরই একাংশে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি। অবশ্য সেই প্রয়াসের অবসান হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. F. E. Pargiter, *Indian Antiquity*, Vol. 30, 1910, p. 204.

২. D.C. Sircar, *Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization*, Calcutta, 1983, pp. 530-31.

৩. রমাপ্রসাদ চন্দ, **গৌড়রাজমালা**, কলিকাতা, ১৯১৫, পৃ. ৮

৪. J.A.S.B (N. S.) 1908, IV, part-I, p. 281 ff.
S.R. Das, *Rājbāḍi dāṅgā*, Calcutta, 1968. p. 56 ff.

৫. J.A.S.B, Letters, Vol-VI. Calcutta, 1945, p. 9.

৬. *Indian Antiquity*, Vol-IV, p. 365.

৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, **পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৪

৮. Amita Chakraborti, *History of Bengal*, Burdwan University, 1991, pp. 111-115.

৯. এম. এ. টিন অনুবাদিত, **রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থতরঙ্গ**, পৃ. ৪৮

১০. বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত, **কলহণের রাজতরঙ্গিণী**, বরেন্দ্র বৈদিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩২-৩৩৫

১১. K.L. Barua, *Early History of Kamarup*, Vol-l, Shillong, 1933, pp. 72-76.

১২. A.M. Chaudhuri, *Dynastic History of Bengal*, Dacca, 1967, p. 148.

১৩. D.C. Sircar, *Select Inscriptions*, Vol-II, Delhi, 1983, p. 482.
১৪. *Epigraphia Indica*, Vol-IX, p. 233.
১৫. Ibid, p. 104.
১৬. D.C. Sircar, *Select Inscriptions*, Vol-II, Delhi 1983, p. 244.
১৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, **শিলালেখ তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গে**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৭৮
১৮. R. Mukherjee and S. K. Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions*, Calcutta, 1967, p. 201.
১৯. দীনেশচন্দ্র সরকার, **পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮৩
২০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, **গৌড়লেখমালা**, রাজশাহী, ১৩১৯, পৃ. ১২১
২১. তদেব, পৃ. ১৫৩
২২. *Ain-I-Akbari*, Jenaetts Trans, Vol-II, p. 131.
২৩. R. Mukherjee and S.K. Maity (ed.), *Corpus of Bengal Inscriptions*, Calcutta, 1967, p. 247.
২৪. Ibid.
২৫. R. Mukherjee & S.K. Maity (ed.) *Corpus of Bengal Inscriptions*, Calcutta, 1967, p, 247.
২৬. রমাপ্রসাদ চন্দ, **গৌড়রাজমালা**, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৮৮
২৭. N.G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, Rajshahi, 1929, pp. 81-115.
Epigraphia Indica, Vol-XXI, p. 211.
২৮. R.C. Majumder, *History of Bengal*, Vol. I, Dacca, 1943, pp. 24-28.

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহত্তর গৌড় পরিমণ্ডলের ধারণা

(ক)

পুরাণকারদের দৃষ্টিতে গৌড়

ভৌগোলিক দিক থেকে গৌড় সম্পর্কিত ধারণার দুটি দিক আছে, একটি সীমিত অপরটি বৃহত্তর। সীমিত অর্থে গৌড়ের ভৌগোলিক অবস্থান প্রাচীন বঙ্গের উত্তরাংশে রাজমহল পর্বতের সন্নিকটে প্রবাহিত পূর্বমুখী ও পরে দক্ষিণাভিমুখী গঙ্গা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে। গৌড়ের বৃহত্তর ধারণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় **শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে**, যেখানে বলা হয়েছে যে বঙ্গদেশের সীমানা থেকে ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যার পুরী জেলা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল গৌড় জনপদ। আবার অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, গৌড়ের পরিধি বিস্তৃত ছিল অঙ্গ জনপদের দক্ষিণ সীমানা থেকে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত।[১] ইতিপূর্বে গৌড় রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্রবর্ধন—বরেন্দ্রী, উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া, তাম্রলিপ্ত, উৎকল এবং বঙ্গ-সমতট—এই সকল জনপদগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এক সময় গৌড়ের রাজনৈতিক ভূগোলের পরিসীমা এক সুবিস্তৃত আকার ধারণ করেছিল।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে গৌড়ের সীমা আরও বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করেছিল। পুরাণকারদের বিবরণ থেকে তাই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত গৌড়ের ধারণা আমরা পাই। **কূর্মপুরাণ** (প্রথমার্ধ, অধ্যায় ২০) এবং **লিঙ্গপুরাণ** (প্রথমার্ধ, অধ্যায় ৬৫) থেকে জানা যায়, শ্রাবস্তীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল উত্তরকোশল নামে যে জনপদ, তাকে বলা হতো গৌড়। আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শ্রাবস্তীর ৪২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গোণ্ড (উত্তর কোশলের একটি বিভাগ) গৌড় নামের একটি বিকৃত রূপ, অর্থাৎ গোণ্ড এবং গৌড় অভিন্ন।[২] ক্যানিংহাম আরও দেখিয়েছেন যে শ্রাবস্তীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি গোণ্ড বা গৌড়েই আবিষ্কৃত হয়েছে। এন. এল. দে মনে করেন যে, গৌড় গোনর্দের বিকৃত রূপও হতে পারে।[৩] আবার **পদ্মপুরাণের** পাতালখণ্ডে (অধ্যায় ২৮, শ্লোক ৮৩) উল্লেখ করা হয়েছে কাবেরী নদী তীরবর্তী গৌড়দেশের (গৌড়দেশে মহারম্যে কাবেরীতীর ভূষিতে)। এন. এল. দে মহাশয় গণ্ডোয়ানাতেও আর একটি গৌড়ের অবস্থিতি ছিল বলে মনে করেন।[৪] সম্ভবতঃ, গোণ্ডকে যেমন

গৌড়ের একটি বিকৃত রূপ বলে মনে করা হয়েছে, তেমনি গণ্ডোয়ানার মধ্যেও গৌড়ের সেই পরিবর্তিত রূপটিকেই নির্দেশ করার প্রয়াস দেখা যায়।

বস্তুতপক্ষে প্রাচীনকালে যখন কোন তীর্থ বা জনপদের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতো, তখন সেই নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তীর্থ বা জনপদের নামকরণ করার রীতি স্বীকৃত হয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ সেই কারণে প্রাচীন বঙ্গদেশীয় গৌড়কে পূর্বগৌড়, গণ্ডোয়ানার গৌড়কে পশ্চিম গৌড়, শ্রাবস্তীর গৌড়কে উত্তর গৌড় এবং কাবেরী নদীতীরস্থ গৌড়কে দক্ষিণ গৌড় বলে মনে করা হয়। আদি মধ্য যুগে পাল-সেন শাসনাধীন গৌড় ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের জনচিত্তকে আকর্ষিত করে। তাছাড়া পুরাণকারদের ভৌগোলিক দৃটিতে সমগ্র ভারতবর্ষের একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ আদর্শরূপে ছিল। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে অতি প্রাচীনকালে রাজা ভরতের নামানুসারে অথবা ভরত নামে একটি জনের (Tribe) নামানুসারে ভারত নামকরণ করা হয়েছিল। তাই **বায়ুপুরাণে** ভারতের অধিবাসীকে বলা হয়েছে **ভারতীপ্রজা** এবং **বিষ্ণুপুরাণে** বলা হয়েছে 'ভারতীসন্ততি'। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে **সপ্তভারত** উল্লেখিত হয়েছে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে, ভারত নামের পরিকল্পনা বা **সপ্ত**-ভারতের ধারণা—এসবের পশ্চাতে ছিল আর্যদের ভারত নামক শাখাটির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব।[৫] অনুরূপভাবে গৌড় নামকরণের মাধ্যমে আদি-মধ্য যুগে ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিকল্পনা দেখা যায়।

(খ)

কলহণের দৃষ্টিতে গৌড়

কলহণ তাঁর **রাজতরঙ্গিণীতে** যে প্রসঙ্গে গৌড়ের উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় যে তাঁর গৌড়-সম্পর্কিত ধারণা প্রাচীন বঙ্গ বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্ড্রবর্ধনে কাশ্মীর থেকে আগত রাজকুমার জয়াপীড় গৌড়ের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনের শাসক ছিলেন জয়ন্ত, যাঁর কন্যাকে জয়াপীড় বিবাহ

করেছিলেন। জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের অধিপতিকে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। এখানে পাঁচটি গৌড়ের কথা বলা হয়েছে, তবে সেই গৌড় নামক রাজ্য বা জনপদগুলির অবস্থান পূর্ব ভারতের বাইরে ছিল বলে মনে হয় না। তার কারণ যে সময়কালের ইতিহাস প্রসঙ্গে কলহণের বিবরণ প্রযোজ্য তা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধের। এই সময় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রভুত্ব নিয়ে যেমন কনৌজের যশোবর্মন এবং কাশ্মীরের ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলেছিল, তেমনি গৌড়ের প্রভুত্ব নিয়েও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পটভূমিকায় কাশ্মীরের রাজকুমার জয়াপীড়ের ভূমিকা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত কারণে কলহণের **রাজতরঙ্গিণীতে** পঞ্চগৌড়ের যে উল্লেখ রয়েছে তার দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পুণ্ড্রবর্ধন বরেন্দ্রী রাঢ় অঙ্গ ও মগধ এই পাঁচটি জনপদকে বোঝান হয়েছে।[৬] বাচস্পতিরাজ **গৌড়বহো** কাব্যে বলেছেন যে পূর্ব-ভারতের শাসক ছিলেন মগধনাথ তিনি গৌড়াধিপও বটে। এই অর্থপূর্ণ উক্তি থেকে অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় গৌড় ও মগধ সংযুক্ত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। যদি আমরা সেই রাষ্ট্রের অনৈক্যের চিত্র প্রকাশ করতে যাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই গৌড় ও মগধের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপন্ন হয়। শশাঙ্কোত্তর কালে এবং প্রাক্-পালপর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের অন্তবর্তী কালে 'গৌড়তন্ত্রে' বা গৌড়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিল তার-ই প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক অনৈক্যে। কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবসান হয়নি। এই বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক এই কারণে যে পালদের অভ্যুদয়ের পূর্বে পূর্ব ভারতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কোন সমর্থিত উপাদানের বিষয় আমরা জানি না। সন্দেহের অবকাশ নেই যে ধর্মপালই সর্বপ্রথম গৌড় ও মগধকে একত্রিত করেছিলেন। অতএব সে ক্ষেত্রে পালদের অভ্যুদয়ের পূর্বেই পুণ্ড্রবর্ধনের রাজার অধীনে সমগ্র গৌড় রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে কাহিনী কলহণ শুনিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

(গ)

স্কন্দপুরাণে পঞ্চগৌড়

শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত **স্কন্দপুরাণ**, রেবাখণ্ডের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ঃ

"সারস্বত কান্যকুব্জা গৌড়মিথিলোৎকল।
পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধস্যোত্তরবাসিনঃ॥

অর্থাৎ বিন্ধপর্বতের উত্তরের অধিবাসীরা পাঁচটি গৌড়ীয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় পঞ্চশাখায় বিভক্ত গৌড়ীয়দের উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শাখা বলে মনে করেন।[৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত **বল্লালচরিতে** এই পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ করা হয়েছে। শেরিং বলেছেন যে, পঞ্চগৌড় নামটির দ্বারা কোন ভৌগোলিক বিভাগের নাম বোঝায় না। এর দ্বারা উত্তর ভারতের পাঁচশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বোঝান হয়েছে।[৮] এই প্রসঙ্গে উইলসন সাহেবের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯] তাঁর মতে গৌড় ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় "The Brahman of the Gaur tribe or caste." তিনি বলেছেন, হিন্দুস্থানের গৌড় ব্রাহ্মণদের বিভাগ অনেক, সংখ্যায় প্রায় ৪২টি। এবং আরও বলেছেন যে এই ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে অপরিচিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা গৌড়ের সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত লেখমালায় (গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত) বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের পরিচয় পাই। বিশেষতঃ পাল সেনযুগের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা এখানে বসতি করতে এসেছিলেন লাট অর্থাৎ গুজরাট, মধ্যদেশ, এবং বোলঞ্চ, তর্কারি, মুক্তাবস্ত, হস্তিপদ, মৎস্যাবাস, কুন্টীর ও চন্দবার নামক স্থান থেকে। বোলঞ্চ অথবা ক্রোড়ঞ্জ নামটি বহুবার বঙ্গদেশীয় লেখমালায় উল্লেখিত হয়েছে। চন্দবার অর্থাৎ চন্দোবার অবস্থিত ছিল উত্তরপ্রদেশের এটওয়ার নিকটে। মুক্তাবস্ত পরমার রাজবংশের লেখমালায় প্রায়শই উল্লেখিত। কিন্তু এর অবস্থান এখনো অজ্ঞাত। হস্তিপদ নামটি পাওয়া যায় কোশলের সোমবংশী শাসকের কুদপাল তাম্রশাসনে। তর্কারি সম্ভবতঃ শ্রাবস্তীতে অবস্থিত ছিল। সিলিমপুর লেখ থেকে জানা যায়

যে তর্কারি থেকে আগত ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্রীতে বালগ্রামে বসতি করেছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তর্কারি বা তর্কারিকা উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রাবন্তীতে অবস্থিত ছিল। যাই হোক লেখমালা সাক্ষ্য থেকে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এমন কি গুজরাট থেকে এসেছিলেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ[১০] এই প্রসঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখে। প্রধানতঃ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে রাঢ়া ও বরেন্দ্রী জনপদের সঙ্গে তাঁদের নাম যুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে কুলজী গ্রন্থমালায় বঙ্গদেশের কান্যকুব্জ বা কনৌজী ব্রাহ্মণদের আগমনের তথ্য নিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় লেখমালায় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কুলজী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে গৌড়ের বর্মন বংশের রাজা শ্যামল বর্মনের আমন্ত্রণে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ১০০১ শকে বাংলাদেশে বসতি করেন। কুলজী গ্রন্থে অন্য একটি ট্র্যাডিশান অনুযায়ী বৈদিক ব্রাহ্মণরা সরস্বতী নদীর তীর থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং রাজা হরিবর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরিদপুরে কোঠালি পাড়া অঞ্চলে বসতি করেন।[১১] কাজেই কুলজী ট্র্যাডিশান থেকে মনে হয় যে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ছাড়াও বৈদিক নামে ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী ছিল। এঁরা বঙ্গদেশে এসে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ হলায়ুধ তাঁর **ব্রাহ্মণসর্বস্ব** গ্রন্থে বলেছেন যে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বেদে কোন অধিকার ছিল না। এই কারণে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল বিশেষতঃ বর্মন-সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বৈদিক ব্রাহ্মণদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য। পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণেরা এসেছিলেন সারস্বত অথবা সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এবং কান্যকুব্জ থেকে। আর দক্ষিণি বৈদিক ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন দ্রাবিড়দেশ (দক্ষিণভারত) এবং উৎকল (উড়িষ্যা) থেকে। বল্লালসেনের **দানসাগরে** সারস্বত এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। গোবিন্দপুর লেখ (গয়া ও বিহার, তারিখ ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে শাকদ্বীপী বা মগ ব্রাহ্মণরা মগধে এসে বসতি করেছিলেন। আবার একটি ট্র্যাডিশান থেকে জানা যায় গৌড়াধিপ শশাঙ্কের আমন্ত্রে গ্রহবিপ্রা এসেছিলেন

গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাঁকে রোগমুক্ত করার উদ্দেশ্যে। অতএব দেখা গেল যে বঙ্গদেশে যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বসতি করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে যেমন একদিকে সারস্বত ও কান্যকুব্জের নিকট সম্পর্ক ছিল তেমনি অন্যদিকে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল দ্রাবিড় এবং উৎকল দেশের সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেকালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গমনাগমন করতেন। যেমন মধ্যদেশের ব্রাহ্মণেরা শুধু যে বঙ্গদেশে বসতি করেছেন তা নয়, মালব, দক্ষিণ কোশল ওড্র প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁরা বসতি বিস্তার করেছেন। সাথ থেকে একদল ব্রাহ্মণ সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য দেশে গিয়ে বসতি করেছিলেন।[২৭] আবার এও জানা যায় যে বঙ্গদেশ থেকে বিভিন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবার উড়িষ্যা মালব এবং দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। এবং সেখানকার শাসকদের কাছ থেকে ভূমি দান পেয়েছিলেন, যেমন গঙ্গ বংশীয় রাজা দেবেন্দ্রবর্মন (৮০৮ খ্রীঃ) এবং তুঙ্গবংশীয় রাজারা (একাদশ শতাব্দী) রাঢ় এবং বরেন্দ্রী থেকে আগত ব্রাহ্মণদের উড়িষ্যায় ভূমি দান করেছিলেন।[১৩] আবার পরমার বংশের রাজা মুঞ্জ (৯৭২-৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) দক্ষিণ রাঢ়ের বিল্বগবাস নামক স্থান থেকে আগত একজন ব্রাহ্মণকে মালব দেশে ভূমি দান করেছিলেন। বরেন্দ্রীর দুইটি ব্রাহ্মণ পরিবার দাক্ষিণাত্যে বসতি করেন এবং রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা চতুর্থ গোবিন্দ (৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খোট্টিগ (৯৬৮ খ্রীঃ) ঐ ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করেন। অতএব দেখা গেল যে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য-এর ব্রাহ্মণেরা যেমন গৌড় দেশে এসে বসতি করেছিলেন তেমনি গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরাও পাশ্চাত্যে ও দাক্ষিণাত্যে গিয়ে বসতি করেন। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এক দেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে অন্য দেশে গিয়ে বসতি বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। এই কারণে যে আদি মধ্য যুগে কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এবং সমগ্র দেশটি কতকগুলি অঞ্চল জনপদ বা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিখণ্ডিত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। কাজেই যদিও উইলসন সাহেব বিশেষ এক শ্রেণীর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের কথা বলেছেন, যাঁরা প্রায় ৪২টি

শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, আমরা কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী বিভাগ পেলাম। এবং তাতে মনে হয় না যে উত্তরপ্রদেশ বা পূর্ব পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণেরা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের নিকট অপরিচিত ছিলেন। অনুরূপভাবে মিথিলা ও উৎকল ব্রাহ্মণেরা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিলেন।

(ঘ)

গৌড় ও আর্যাবর্ত

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখের ভিত্তিতে দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে গৌড় নামটি সমগ্র আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাঁর এই অভিমতের ভিত্তি হল ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লেখ। যেখানে পঞ্চগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।[১৪] আবার মালবদেশের পরমার বংশীয় রাজা ভোজ (১০১০-১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা রচিত একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাস দিনত্রয়ম্।[১৫]
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ॥

এই শ্লোকে যে ট্র্যাডিশান রয়েছে তা থেকে অনুমিত হয় যে রাজা ভোজ গৌড় এবং দক্ষিণাপথে ৫৫ বৎসরের কিছু অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে এখানে গৌড় বলতে সমগ্র উত্তরভারতকে বোঝান হয়েছে।[১৬] যদি আমরা দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে আর্যাবর্ত ও গৌড় সমার্থক হয়ে উঠেছিল।

সরকার মহাশয়ের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করলেও একটি ক্ষুদ্র সমস্যা থেকে যায়। ইতিপূর্বে আমরা পুরাণকারদের বিবরণকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি গৌড় দেশের অবস্থিতি দেখেছি। সেগুলি হল যথাক্রমে গৌড়, শ্রাবস্তী, গণ্ডোয়ানা এবং কাবেরী রাষ্ট্র। যদি আমরা ধরেও নিই যে এই চারটি গৌড়ের পরিকল্পনা আদি মধ্য যুগের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের, তাহলে গৌড়কে আর্যাবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তার বিস্তৃতি ঘটেছিল দ্রাবিড় দেশ পর্যন্ত। কেননা কাবেরী

নদীতীরবর্তী গৌড়দেশ নিঃসংশয়ে দ্রাবিড়দেশে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া গণ্ডোয়ানা যার অবস্থান ছিল মহানদীর দক্ষিণে গোদাবরী নদীর উত্তরে এবং কলিঙ্গের পশ্চিমে তাকেও আমরা আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। আবার **স্কন্দপুরাণে** যে উৎকলকে অন্যতম গৌড় বলে আখ্যাত করা হয়েছে তাও ছিল গণ্ডোয়ানার পার্শ্ববর্তী এবং তাকেও নিঃসংশয়ে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জ এবং সারস্বত। সেক্ষেত্রে **স্কন্দপুরাণোক্ত** উৎকল এবং **পদ্মপুরাণোক্ত** কাবেরী নদী তীরভুক্ত গৌড়দেশের উল্লেখকে অগ্রাহ্য করা হয়। অতএব আর্যাবর্তের সঙ্গে গৌড়ের সমীকরণ কতকাংশে সত্য হলেও সত্য নয়।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় **নীতিশাস্ত্রোক্ত** চক্রবর্তী ক্ষেত্রের কথা প্রাসঙ্গিক। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে চক্রবর্তীক্ষেত্র** বিস্তৃত ছিল হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত। আবার উত্তরভারতীয় রাজারা আর্যাবর্তকে তাঁদের **চক্রবর্তীক্ষেত্র** বলে মনে করতেন। এবং দক্ষিণ ভারতীয় শাসকরা উত্তরে বিন্ধপর্বতের দক্ষিণে পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভূখণ্ডকে তাঁদের **চক্রবর্তীক্ষেত্র** বলে মনে করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় রাজারা বিন্ধপর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে তাঁদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভিযান করেছেন। আবার কখনো কখনো দক্ষিণ ভারতীয় রাজারাও বিন্ধপর্বত অতিক্রম করে উত্তর ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন। সেক্ষেত্রে সেইসব দিগ্বিজয়ীরা কখনোই তাঁদের **চক্রবর্তীক্ষেত্রকে** বিন্ধপর্বতের উত্তরে বা দক্ষিণে সীমিত বলে জানতেন না। মনে হয় **ভোজপ্রবন্ধে** দুই **চক্রবর্তীক্ষেত্রের** মধ্যে একটি পার্থক্য বিবেচিত হয়েছে। এবং সেই কারণে **সগৌড়াদক্ষিণাপথ**, এই অভিব্যক্তিটির দ্বারা গৌড় সহিত বা উত্তরাপথ সহিত দক্ষিণা পথের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় **ভোজপ্রবন্ধের** এই বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কৌটিল্য থেকে শুরু করে কামন্দক শুক্র বা তাঁরও পরবর্তী নীতিশাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করেননি। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে পুরাণকারেরা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অর্থাৎ সর্ব ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গৌড়ের ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন। এবং লক্ষণীয় যে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নীতিশাস্ত্রকারদের **চক্রবর্তীক্ষেত্রের** সংজ্ঞার সাদৃশ্য রয়েছে।

(৬)

গৌড়ের রাজনৈতিক সম্প্রসারণ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে গৌড় রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় শশাঙ্কের রাজত্বকালে। শশাঙ্ক গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমে মগধ ও বারাণসীকে অতিক্রম করে মালব ও কান্যকুব্জ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তার পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে বৌদ্ধগ্রন্থ **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে** বাণভট্টের **হর্ষচরিত** এবং হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে। শশাঙ্ক অস্থায়ীকালের জন্য হলেও কনৌজে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—এ তথ্য সর্বজনবিদিত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারণে ধর্মপালের কীর্তি অবিস্মরণীয়। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তাঁর 'মহোদয়শ্রী' অর্থাৎ কান্যকুব্জ অধিকারের কথা। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, তিনি কেদার (হিমালয়ের গাড়হয়াল অঞ্চলে) এবং গোকর্ণ (উত্তর কানাড়া জেলায় অথবা নেপালে) জয় করেন। ধর্মপালের নিজের খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তিনি কনৌজে তাঁর মনোনীত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা উপলক্ষে ভোজ (বেলব), মৎস্য (রাজস্থানের জয়পুর ভরতপুর অঞ্চল), মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), ভুরু (পূর্ব পাঞ্জাব), যদু (সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের সিংহপুর), যবন (সিন্ধু অঞ্চলে), অবন্তি (মালব), গান্ধার (পশ্চিম পাঞ্জাব) এবং কীর (উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাব) প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের দ্বারা আহূত দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, নারায়ণ পালের বাদাল স্তম্ভ লেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধপর্বত পূর্বে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে আরব সাগরের দ্বারা বিধৃত ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত ভূভাগের শাসকেরা দেবপালের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। ঐ একই লেখ থেকে আরও জানা যায় যে তিনি উৎকল হূণ দ্রাবিড় এবং গুর্জর (প্রতীহার) শক্তিকে দমিত করে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে দাবী করা হয়েছে যে দেবপাল প্রাগ-জ্যোতিষের (কামরূপ) রাজার বশ্যতা আদায় করেছিলেন। দেবপালের নিজের মুঙ্গের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁর দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল একদিকে বিন্ধারণ্য

পর্যন্ত অন্যদিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কম্বোজ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিল। ঐ একই লেখতে আরও দাবী করা হয়েছে যে দেবপালের সাম্রাজ্য দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দেবপালের দিগ্বিজয় উপলক্ষে দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক সাফল্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যে দ্রাবিড় রাজা দেবপালের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন তিনি পাণ্ড্যবংশের রাজা শ্রী-মার শ্রী-বল্লভ ব্যতীত আর কেউ নন।[১৭] সীন্ন মন্নুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় উক্ত পাণ্ড্য রাজা কুম্ভকোনম্ নামক স্থানে গঙ্গা-পল্লব-চোল কলিঙ্গ এবং মগধদের একটি সম্মিলিত শক্তি সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই শক্তিসংঘের অন্তর্ভুক্ত মগধরা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে পাল রাজশক্তির দ্যোতক। মজুমদার মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা যদি গৃহীত হয় তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব সুদূর দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগের পূর্বেই। গৌড়ীয় শাসকদের **চক্রবর্তীক্ষেত্র** আর্যাবর্তকে অতিক্রম করে দক্ষিণাপথে প্রসারিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে **পদ্মপুরাণোক্ত** কাবেরী নদীতীরবর্তী গৌড়দেশের উল্লেখ আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কাবেরী নদীতীরের সঙ্গে গৌড়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ দেবপালের সময়ই যে সমাপ্ত হয়েছিল তা নয়; প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে রাজেন্দ্রচোল গৌড় পর্যন্ত এক সফল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।[১৮] এবং সেই সাফল্যের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নিজের উপাধি এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগরীর নামের সঙ্গে গঙ্গার নামটি বার বার যুক্ত করেছেন। এইভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের সঙ্গে কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হয়। আবার রামপালের রাজত্বকালে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ দিগ্বিজয় অভিযান করেছিলেন কলিঙ্গদেশের উত্তরসীমান্ত পর্যন্ত।[১৯] তদানীন্তন পালবংশের রাজা রামপালের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সখ্য স্থাপিত হওয়ায় তিনি কলিঙ্গের সীমা অতিক্রম করে গৌড়ে প্রবেশ করেন নি। কাবেরীর নদীতীরের সঙ্গে চোল রাজ্যের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে। কাবেরী তীরবর্তী উরইয়ুর (ত্রিচিনপল্লীর নিকট) ছিল চোলদের প্রথম রাজধানী, পরবর্তীকালে তা স্থানান্তরিত হয় তাঞ্জরে।[২০]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আর্যাবর্তে বা উত্তরভারতে গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব এক শতাব্দীকাল ধরে বজায় ছিল। সেই উপলক্ষে সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকলে গৌড়ের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। এখন এই স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। প্রথমত, **বরাহ পুরাণের** (তৃতীয় অধ্যায়) সাক্ষ্য অনুযায়ী সারস্বত অবস্থিত ছিল রাজপুতানার আজমীরের নিকটে পুষ্কর হ্রদ অঞ্চলে। আবার **জৈমীনি ভারতে** (অধ্যায় ৫৭) বলা হয়েছে যে সারস্বত অথবা সারস্বতপুর হস্তিনাপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। যাইহোক, আমাদের মনে হয় যে বর্তমান হরিয়ানায় (পূর্বতন পূর্ব পাঞ্জাব) কুরুক্ষেত্র অঞ্চলটি সারস্বত নামটির দ্বারা লক্ষিত হয়েছে। কারণ, শ্রীধরস্বামী (১৪০০ খ্রীঃ) তাঁর **ভাগবত পুরাণের** টীকায় লিখেছেন যে, বিনশন (যে স্থলে সরস্বতী নদীর স্রোতধারা লুপ্ত হয়েছে) কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।[২১] দ্বিতীয়ত, কান্যকুব্জ, অর্থাৎ কনৌজ উত্তরপ্রদেশে ফারুকাবাদ জেলায় কালি নদী এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ৬ মাইল উত্তরে কালিন্দীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ যুগে কনৌজ ছিল দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী। রাজশেখরের **কর্পূরমঞ্জুরী** (তৃতীয় অঙ্ক) থেকেও জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও কনৌজ দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শ্রাবস্তী (সাহেৎ মাহেৎ) বর্তমানে উত্তর প্রদেশের গোণ্ড জেলায় রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অযোধ্যার ৫৮ মাইল উত্তরে শ্রাবস্তী উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল।[২২] তৃতীয়ত, মিথিলা ছিল প্রাচীনকালে বিদেহ রাজ্যের রাজধানী (মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ২৫৪)। পরবর্তীকালে মিথিলা তীরভুক্তি (বর্তমান ত্রিহুত) নামে পরিচিত হয়। তীরভুক্তির পূর্বদিকে ছিল কোশী নদী দক্ষিণে গঙ্গা নদী পশ্চিমে সদানীরা (গণ্ডক অথবা রাপ্তী) এবং উত্তরে হিমালয়।[২৩] চতুর্থত, উৎকল, **ব্রহ্মপুরাণের** (অধ্যায় ৪৭) সাক্ষ্য অনুযায়ী অবস্থিত ছিল বর্তমান উড়িষ্যার উত্তরভাগে। উৎ-কলিঙ্গ, এই কথাটির বিকৃত রূপ উৎকল। উৎ-কলিঙ্গের অর্থ কলিঙ্গের উত্তরাংশ।[২৪]

অতএব ভৌগোলিক অবস্থানের বিশ্লেষণের এবং পূর্বোক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তিতে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না যে ধর্মপালের সময়ে সারস্বত কান্যকুব্জ ও মিথিলায় গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

এবং দেবপালের সময়ে উৎকলে গৌড়ের প্রভাব দৃষ্ট হয়। দেবপালোত্তর কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাবের বিস্তার অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবে মিথিলা বা উত্তর বিহার অঞ্চলে পালদের প্রভাব দীর্ঘকাল বজায় ছিল এই কারণে যে মগধ ছিল তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্র। আবার রামপালের রাজত্বকালে উৎকলে গৌড়ের প্রভাব পুনপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কান্যকুব্জ বা সারস্বত অঞ্চলে দেবপালোত্তর কালে গৌড় রাষ্ট্রের প্রভাব বজায় ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর কনৌজকে কেন্দ্র করে প্রতীহাররা তাদের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে। এবং প্রতীহার সাম্রাজ্যের পতনের পর কনৌজকে কেন্দ্র করে গারহবাল শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল। কাজেই বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর থেকে গৌড় রাষ্ট্রের প্রভাব পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও উৎকলেই বজায় ছিল প্রায় শেষ পর্যন্ত। সেন যুগেও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মিথিলা এবং উৎকলে গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব যে বজায় ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই বিজয়সেন এবং লক্ষণসেনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ থেকে, সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। অবশ্য লক্ষ্মণসেনের পক্ষে দাবী করা হয়েছে তাঁর বংশধরদের লেখমালায় যে তিনি পশ্চিমে বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত দিগ্বিজয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই দাবী নিতান্তই প্রশস্তিমূলক বলে মনে হয়। কারণ সমসাময়িক কালে প্রবল পরাক্রান্ত গাড়হবাল শক্তিকে পরাভূত করে লক্ষ্মণসেনের পক্ষে উত্তরভারতে কোন স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা কালানুক্রম অনুযায়ী কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে সারস্বত কান্যকুব্জ ও মিথিলা গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে উৎকলও গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন হয়েছিল। তাছাড়া গৌড় রাষ্ট্রের প্রভাব সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তৃতীয়ত, নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কালে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব মিথিলা ও উৎকলে সীমিত হয়ে পড়ে। অবশ্য কামরূপে রাজনৈতিক প্রভাব গৌড়ের শাসকরা

বিস্তার করতে এই সময় সচেষ্ট ছিলেন। কামরূপে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সূত্রপাত হয়েছিল অবশ্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই। যাই হোক রাজনৈতিক দিক থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে পঞ্চগৌড়ের ধারণা অথবা গৌড় ও আর্যাবর্ত সমার্থক এই ধারণা পরিপুষ্ট হয়েছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগের মধ্যে। মনে হয় সেই এক শতাব্দীকালের যে ট্র্যাডিশান গড়ে উঠেছিল পুরুষানুক্রমে বজায় ছিল বলেই খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লেখতে পঞ্চগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত **ভোজ প্রবন্ধে** উত্তরাপথ ও গৌড় সমার্থক বলে উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া কাবেরী নদী-তীরবর্তী গৌড় দেশের উল্লেখ, যা আমরা **পদ্মপুরাণে** পাই, তাও প্রকৃতপক্ষে নবম শতাব্দীর গৌড়ীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের স্মৃতিকে বহন করে, যদিও সেই গৌড়ীয় কাবেরী রাষ্ট্রের সঙ্গে গৌড়ের সম্বন্ধ পাল-চোল রাজনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা বজায় থাকার সম্ভাবনা একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়।

(চ)
গৌড়মণ্ডলের সাংস্কৃতিক প্রসারণ

গৌড় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পূর্বভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেও, সমগ্র পূর্বভারতে গৌড়ীয় সংস্কৃতির প্রভাব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে 'গৌড়' নামের দ্বারা প্রাচ্য বা ভারতের পূর্বদেশকে বোঝান হতো। সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম ছিল গৌড়ীয় কাব্যরীতি, গৌড়ীয় লিপি এবং গৌড়ীয় ভাষা।

গৌড়ী রীতি ঃ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কাব্যরীতির কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি, কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট তাঁর **হর্ষচরিতে** সর্বপ্রথম কাব্যের ক্ষেত্রে উদীচ্য প্রতীচ্য দাক্ষিণাত্য এবং গৌড়দেশে প্রচলিত কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। দণ্ডী তাঁর **কাব্যাদর্শে** "গৌড়ীয় মার্গের" উল্লেখ করেছেন। এবং বামনের **কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে** 'গৌড়ীয় রীতির' উল্লেখ করা হয়েছে। দণ্ডী গৌড়ীয় মার্গকে প্রাচ্য দেশের কাব্য পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার

সঙ্গে বৈদর্ভী অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য রীতির পার্থক্য নির্দেশ করেন। ভামহ তাঁর কাব্য **কাব্যালঙ্কারে** বিভিন্ন কাব্যরীতির উল্লেখ করেছেন। বামন বলেছেন যে বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পঞ্চালী, এই তিন কাব্যরীতি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানায়। যাই হোক আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন কাব্যরীতির যে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে গৌড়ীরীতি সামগ্রিকভাবে পূর্বভারতের কাব্যের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। গৌড়ীরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল 'ওজ' অর্থাৎ রচনার ঘনত্ব এবং 'কান্তি' অর্থাৎ শব্দমাধুর্য। আবার কেউ কেউ এই রীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'আক্ষর ডম্বুর' উল্লেখ করেন। একই ভিত্তিতে 'ওজ' গুণ বৃদ্ধি পায়। গৌড়ী রীতির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় লেখমালায়, উমাপতি ধর তাঁর দেওপাড়া প্রশস্তি রচনায় এই রীতির প্রয়োগ করেছেন। তাছাড়া শ্রীধরের **সদুক্তিকর্ণামৃত** নামক সংকলনে শরণ ধোয়ী প্রমুখ কবিদের যে সব শ্লোক আছে তাতেও গৌড়ী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।[২৫] এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে গৌড়ের দরবারে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা যে কাব্যচর্চা ও অনুশীলন দীর্ঘকাল ধরে করেছিলেন তারই ফলে এই গৌড়ীয় রীতি গড়ে ওঠে। গৌড়ের শাসকদের অধিকার যেহেতু অঙ্গ মগধ গৌড় বঙ্গ উৎকল ও কামরূপ অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল বজায় ছিল সেকারণে তাঁদের দরবারে যে কাব্যরীতি গড়ে উঠেছিল তা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন জনপদ ও রাজ্যগুলিতে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়। এই কারণে আলঙ্কারিকরা যথার্থ ই গৌড়ী রীতিকে প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছেন।

গৌড়ী লিপি ঃ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম পূর্বভারতের লেখগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে পূর্বভারতীয় লেখতে ব্যবহৃত লিপিতে নাগরীর প্রভাব ছিল না বল্লেই চলে।[২৬] পূর্বভারতে ব্যবহৃত লিপি নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করে এবং পণ্ডিতেরা সেই লিপির নাম দিয়েছেন: —Proto-Bengali, এই লিপির পরিচয় পাওয়া যায় নারায়ণপালের (৮৫৪-৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) ভাগলপুর তাম্রশাসনে যার প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ বিহার। একাদশ

শতাব্দীতে প্রাক্-বাংলা লিপির আদল এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে পূর্বভারতের লিপির সঙ্গে পশ্চিম ভারতের লিপির পার্থক্য পূর্বের চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়। এই কারণে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে গয়া থেকে পূর্বদিকে বাংলা লিপি তার নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল।[২৭] একাদশ শতাব্দীর পূর্বভারতীয় লিপির উদাহরণ পাওয়া যায় বিজয় সেনের দেওপাড়া লেখতে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন ও সুন্দরবন তাম্রশাসনে প্রাক্-বাংলা লিপির (**Proto Bengali**) গঠন সম্পূর্ণতা লাভ করে।[২৮] পূর্বভারতে প্রাপ্ত লেখমালায় ব্যবহৃত লিপিকে প্রাক্-বঙ্গীয় লিপি আখ্যাত করা কতটা সমীচীন সে বিষয় দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তাঁর মতে তথাকথিত প্রাক্-বঙ্গীয় লিপি বঙ্গদেশ বিহার (মিথিলা সহ) অনার্য এবং উড়িষ্যায় খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হতো। অতএব সেই কারণে এই লিপির নাম হওয়া উচিত 'গৌড়ীয় লিপি' বা পূর্বভারতীয় লিপি।[২৯]

গৌড়ী ভাষা ঃ

বাংলাভাষার মূল, প্রাচীন ভারতীয়—আর্য (অর্থাৎ সংস্কৃত) ভাষা। এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত। এর পর দ্বিতীয় স্তরে আমরা পাই মধ্য ভারত-আর্য ভাষা। (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-১০০০ খ্রীঃ) এই ভাষার রূপ পালি, অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃত, অশোকোত্তর-কালে লেখমালায় ব্যবহৃত প্রাকৃত এবং সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী প্রভৃতি ক্রমবিবর্তিত আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা। তৃতীয় স্তরে নব্য-ভারত আর্যভাষার বিবর্তন ঘটে আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময় প্রাকৃত ভাষা থেকে আঞ্চলিক অপভ্রংশ রূপ লাভ করে এবং তার থেকে ক্রমশঃ আধুনিক ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলি দেখা দেয়। সুকুমার সেন বলেছেন যে, আর্যাবর্তের অন্যত্র প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার তুলনায় প্রাচ্য প্রাকৃত সংস্কৃত থেকে বেশি বিচ্যুত হয়েছিল। এই প্রাচ্য প্রাকৃত কালক্রমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে রূপ ধারণ করেছিল তাকে বলা হয় প্রাচ্য-অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ, প্রাচ্য 'অবহট্‌ঠ' (অর্থাৎ অপভ্রষ্ট)। 'অবহট্‌ঠ' পরে তিনটি আঞ্চলিক আধুনিক আর্য ভাষায় পরিণত হয়, পশ্চিমে বিহারী, উত্তর পশ্চিমে মৈথিলি, এবং পূর্বে বাংলা-

মগধী (দক্ষিণ বিহারে) উৎপন্ন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ও বিহারী ভাষা থেকে আধুনিক ভোজপুরী (পশ্চিম বিহারে) ও উড়িয়া। অসমিয়া প্রায় একই ভাষা রূপ ধারণ করেছিল।[৩০] অতএব ভাষার দিক থেকে বিচার করলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে পূর্বভারতে একটি সংস্কৃতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ আবিষ্কার করেন। তেমনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভাষাতত্ত্ববিদরা চর্যাপদের ভাষাকে বাংলাভাষার আদিরূপ বলে মনে করেন। অপরদিকে কে. এল. বড়ুয়া এবং অন্যান্য অসমিয়া পণ্ডিতেরা চর্যাপদের ভাষাকে 'কামরূপী' আখ্যা দিয়েছেন। তেমনি জে. কে. মিশ্র এবং অন্যান্যরা চর্যাপদের ভাষাকে মৈথিলি উড়িয়া এবং পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দির প্রাচীন রূপ বলে মনে করেন।[৩১] দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় সঙ্গত কারণেই বলেছেন যে চর্যাপদের ভাষা, যা বাংলা অসমিয়া মৈথিলি উড়িয়া ও পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দি ভাষার রূপ বলে স্বীকৃত তার নাম হওয়া উচিত 'গৌড়ী' বা প্রাচ্য ভাষা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মিথিলা মগধ গৌড় বঙ্গ উৎকল ও কামরূপ, এই দেশগুলি নিয়ে একটি প্রাচ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যার নাম দেওয়া যেতে পারে গৌড়ীয় সংস্কৃতি। কারণ এই যুগে গৌড়ীয় শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে অথবা রাজনৈতিক প্রভাবাধিনে পূর্বভারতের দেশগুলিতে একটি সাধারণ কাব্যরীতি লিপি ও ভাষা গড়ে উঠেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে পালযুগে মাৎস্যন্যায়ের অবসানে বাংলা ভাষা সাহিত্য লিপি ও শিল্পকলা এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করায় বাঙালীর ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়।[৩২] কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃটিভঙ্গির পার্থক্য অনিবার্য। তাই তাঁর মতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও আমরা বলতে পারি যে পাল-সেন যুগে গৌড়ী ভাষা সাহিত্যলিপির এমন বিকাশ ঘটেছিল যার ফলে প্রাচ্য ভারত সমগ্র ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

(ছ)

বৃহত্তর গৌড়ের সামাজিক দিক

স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ডে যে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার **কুলজী** অথবা **কুলশাস্ত্রে**। এই সব **কুলজীর** মধ্যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত মহাবংশাবলীর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তারও পরবর্তীকালে রচিত হয় নুলোপঞ্চাননের **গোষ্ঠীকথা** এবং বাচস্পতি মিশ্রের **কুলরাম**। এইভাবে সমস্ত কুলজীশাস্ত্র রচিত হয়েছিল ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।[৩৩] ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে সারস্বত ও কনৌজী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্রাবিড়ি ও উৎকলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁদের পরিচয় মধ্য যুগে রচিত কুলজী গ্রন্থ থেকে যেমন পাওয়া যায় তেমনি মৈথিলি ব্রাহ্মণরাও মধ্য যুগের বাংলায়, বিশেষতঃ নদীয়ায়, নব্যন্যায়ের চর্চা আমদানি করেছিলেন।[৩৪] নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সারস্বত কান্যকুব্জ মিথিলা এবং উৎকল থেকে এসে গৌড় রাষ্ট্রে বা জনপদে বসতি করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। এবং সেই সূত্রে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের ধারণার সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের ধারণা কুলজী অথবা **কুলশাস্ত্রের** মাধ্যমে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি লেখতে কানাড়া, তামিল, তেলেগু এবং গুরজর নামে চারটি দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণের শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। **শব্দকল্পদ্রুমে স্কন্দপুরাণ** থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে ; দ্রাবিড়, কর্নাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র এবং তৈলঙ্গ। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় মনে করেন যে দ্রাবিড় ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য হেতু দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিনি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণীর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই ধারণা করতে হয় যে সারস্বত থেকে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড সাধারণ গৌড় নামের দ্বারা পরিচিত ছিল। এবং অঞ্চল ভেদে এবং ভাষাগত পার্থক্যহেতু তারা পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল। এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে স্বাভাবিক ভাবেই গৌড় এবং আর্যাবর্ত সমার্থক বলে মনে

করা যেতে পারে। তাঁর মতের সমর্থনে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর লেখগত ও সাহিত্যগত প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে আলোচনা করেছি তার থেকে অনিবার্যভাবে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

১. খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল।

২. খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়ী-লিপি ও ভাষার ভিত্তিতে যে বিশিষ্ট গৌড়ীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার বিস্তার ছিল প্রাচ্য ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অতএব দশম একাদশ শতাব্দীতে গৌড় বলতে সমগ্র আর্যাবর্তকে বোঝাতে গেলে ঐতিহাসিক প্রমাণের বাধা পেতে হয়। সেক্ষেত্রে এই ধারণা করা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী যুগের একটি ট্র্যাডিশান পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা কুলজী গ্রন্থের আলোকে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের যে ব্যাখ্যা পেলাম তাতে মনে হয় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গৌড়ে আগত ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। কারণ যে যুগে এই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৌড়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সে যুগে গৌড় বলতে নিশ্চয়ই আর্যাবর্তকে বোঝাত না।

অতএব বৃহত্তর গৌড়ের ধারণা সর্বদা একই প্রকার ছিল না। গৌড় রাষ্ট্র যেমন বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়েছে তেমনি বৃহত্তর গৌড়ের ধারণাও কখনো বিস্তৃত কখনো সংকুচিত হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে সেই ধারণা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করেছিল, সাংস্কৃতিক দিক থেকে সেই ধারণা প্রাচ্য দেশের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। তবে যেহেতু ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশান বা ঐতিহ্যে বিশ্বাস চিরকাল আছে সেই কারণে গৌড়ের একটি সর্বভারতীয় রূপ আভাষিত হয়েছে পরবর্তীকালে পুরাণকারদের দৃষ্টিতে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. *The literary Remains of Dr. Bhau Daji* : N. L. Dey, The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, (*GDAMI*) (Delhi, 1927), p. 63.

২. Alexander Cunningham, *The Ancient Geography of India*, Varanasi, p. 343.
৩. *GDAMI*, p. 63.
৪. *Ibid.*
৫. H. C. Roychowdhury, *Studies in Indian Antiquities*, Calcutta, 1958. p. 77,
৬. A. Stain, *Rajatarangini*, Vol. I, London, 1900, p. 163, *J.A.S.B*, p. 1908, p. 208.
৭. D. C. Sircar, *Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971, (GAMI), p. 121.
৮. Sherring, *Hindu & Tribes and Castes*, p. 19, quoted in *GDAMI*, p. 145.
৯. Wilson's *Glossary of Judicial and Revenue Terms*, Ref. *GAMI*, p. 121.
১০. R. C. Majumder, (ed). *History of Bengal*, Dacca, 1943, pp. 579-583.
১১. *JASB*, (NS) XII. p. 295, EP. IND. VOL. XXIII, p. 105 EP. IND. Vol. XXII, pp. 137, 165.
১২. *Indian Antiquary*, 1893, p. 74.
১৩. EP. IND. Vol. XXIII, p. 27, *JASB* (NS), Vol-XII, p. 295, *Archaeological Survey of Mourvonj*, p. 156.
১৪. EP. IND. Vol-XXXII, p. 38.
১৫. ভোজ প্রবন্ধ, (কলিকাতা সংস্করণ) পৃ. ৩ ।
১৬. *GAMI*, p. 122.
১৭. R. C. Majumder (ed.), pp. 20-21.
১৮. *Ibid*, pp. 137-139.
১৯. *Ibid*, pp. 163-64.
২০. *GDAMI*, p. 51.
২১. H. C. Roychowdhury, *Studies in Indian Antiquities*, Calcutta, 1958, p. 139.
২২. *GAMI*, pp. 89, 189.
২৩. B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1968, p. 280.

২৪. *GAMI*, p. 213.

২৫. Siboprosad Bhattachariya, 'The Gaudi Riti in Theory and Practice', *Indian Historical Quarterly*, Vol-III, No. 2, 1927, pp. 376-394.

২৬. R. D. Banerjee, *The Origin of the Bengali Script*, Calcutta, 1973, p. 38.

২৭. *Ibid*, pp. 75-76.

২৮. Depak Chattopadhyay, 'Development of the Bengali Script', in Bhaskar Chattopadhyay (ed.) *Culture of the Bengal through the ages*, Burdwan University pp. 118-19.

২৯. *GAMI*, p. 118.

৩০. সুকুমার সেন, **বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস**, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১০

৩১. K. L. Barua, *Early History of Kamarupa* p. 318.
J. K. Misra, History of Maithili Literature, P-X.

৩২. Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin and Development of Bengali Language*, Vol-I, Calcutta, 1985, p. 67.

৩৩. R.C. Majumder (ed.), *History of Bengal*, Vol-I, Dacca, 1943, pp. 623-24.

৩৩. B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1968, pp. 280-283.

৩৪. B. C. Law. *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1968, pp. 280-283.

সংযোজন

বাণগড় প্রত্নসমীক্ষা

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বাণগড় থেকে প্রাচীন নগর সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি পূর্ব ভারত অঞ্চলে প্রাচীনকালে নগরায়ণের সভ্যতাকে প্রমাণ করে। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এস. সি. মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাণগড় অঞ্চলে খননকার্য শুরু হয়। ১৯৩৮-৩৯, ১৯৩৯-৪০, এবং ১৯৪০-৪১ সালের শীতকালে এই খননকার্যের কাজ চলে। এই সময়ে ৩৫০´ উত্তর দক্ষিণ ও ৩০০´ পূর্বপশ্চিম অঞ্চলে কাজ শুরু হয়। এই খনন কার্যে পাঁচটি স্তর পাওয়া গেছে।

প্রথম স্তর—প্রাথমিক পর্বে দক্ষিণ পশ্চিম (Tr. No. 9. I. C.) অঞ্চল দিয়ে খনন কার্য শুরু করা হয়। এই স্তরে বেশ কয়েকটি ঢিপি, মৃৎপাত্র, ইট, পানপাত্র ও কাপ ডিসের ভগ্নাংশ অবিষ্কৃত হয়েছে এছাড়াও মাটির কুঁজো, কলসি, নীল ও ধূসর রঙের পাত্র পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা এগুলি মুসলিম সময়ের বলে অভিহিত করেছেন, দক্ষিণ পশ্চিম ভাগেই (Tr. No. 9) কিছু অট্টালিকা, কেল্লা প্রাচীর ও দুটি বৃত্তাকার বেসিন পাওয়া গেছে, আগের দিনের মূল ঢিপিটিতে নগর দুর্গের বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার রাজবাড়ীর ১৫ ফুট উচ্চতা যুক্ত ভগ্ন অংশ পাওয়া গেছে। ঢিপিটি পুনর্ভবা নদীর সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন নগর কোটিবর্ষের নগর পরিকল্পনা ছিল বর্তমান দিনের অনুরূপ। সমগ্র অঞ্চল কেল্লা দ্বারা আবৃত ছিল। বর্তমানে বেশির ভাগ অঞ্চল জঙ্গলপূর্ণ, কিছু জায়গায় প্রাচীর বর্তমান আছে। এই স্তরে মুসলিম যুগের সাথেই মৌর্য-শুঙ্গ যুগেরও চিহ্ন বর্তমান। এই স্তরের প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে শেষ হিন্দু শাসকদের সময়কার বস্তুও পাওয়া গেছে, খননকার্যের 'Trench 5'-এ এগুলো আছে।

খনন কার্যের দ্বিতীয় স্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে ১½ ফুট—৩½ ফুট এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঘরবাড়ীর অংশ পাওয়া গেছে। এই স্তরে পরবর্তী হিন্দু আমল ও পাল যুগের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্লক ১ এবং ব্লক ২ থেকে সুদৃশ্য কুণ্ড ও স্তম্ভ পাওয়া গেছে। ৫১ স্কোয়ার ফুট যুক্ত পদ্ম আকৃতির একটি অট্টালিকা

হয়েছে। এগুলি মৌর্য যুগের বলে মনে করা হয়। এই স্তর থেকে ইটের টুকরো, পাথরের তৈরী জিনিষ ও পাঞ্চমার্ক মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সকল প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি মৌর্য যুগে এই অঞ্চলে নগরায়ণের সত্যতাকে প্রমাণিত করে।

(তথ্য ও চিত্রের ক্ষেত্রে কে. জি. গোস্বামীর, Excavation at Bangarh' Rajshahi পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।)

মহাস্থানগড় প্রত্নসমীক্ষা

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়ার নিকটে করতোয়া নদীর তীরে প্রাচীন মহাস্থানগড় অবস্থিত। ১৯৩১ সালে এখানে উৎখনন কার্য শুরু হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর সময়কালের প্রচুর প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। যেগুলি ঐ অঞ্চলের নগরায়ণকে সমর্থন করে। এখানে প্রাচীন পুণ্ড্ররাজাদের রাজধানী ছিল বলে অনেকে মনে করেন। হিউ-এন-সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এই অঞ্চল ভ্রমণ করে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তার ভিত্তিতে জানা যায় এখানে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং প্রায় ৬০০০ শ্রমণের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। এই অঞ্চলে খননের ফলে একটি Kosthāgāra বা store house আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মৌর্য যুগের বলে মনে করা হয়। এখানে স্থানীয় জনগণের আপতকালীন সাহায্যের জন্য শস্য ও সম্পদ সঞ্চিত রাখা হত। অপর দিকে মহাস্থান থেকে মৌর্য যুগের গুরুত্বপূর্ণ লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলের বসতি কেন্দ্রটি বরেন্দ্রভূমির ২৪° উত্তর ও ২৬° দক্ষিণ ভাগের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

মহাস্থানগড় অঞ্চল খননের ফলে হিন্দু রাজাদের দুর্গের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়াও ইট ও পাথর নির্মিত 'খোদার পাথর' ও 'মানকালীর কুণ্ড', চারটি ধ্যানী বুদ্ধ ও ভক্তদের খোদিত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। অপর দিকে করতোয়া নদীতীরে একাধিক ঢিবির অস্তিত্ব ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ৫ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকার অঞ্চলে এই ঢিবিগুলি অবস্থিত, এটির দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট এবং ৪৫০০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট এবং শস্যক্ষেত্র থেকে ১৫ ফুট উচ্চ। গোবিন্দ ভিটায় মন্দির কক্ষ ও ভিত পাওয়া গেছে।

মূল ঢিবিগুলির পরিমাপ

Sura-dighir dhāp—100′ × 90′ × 30′
Khulna—300′ × 230 × 30′
Laona—25′ × 30′ × 30′
Dhankir dhāp—20′ × 25′ × 12′
Madarir garh—20′ × 20′ × 15′
Padmayati—300′ × 200′ × 10′
Vishamardon—50′ × 50′ × 7′
Jogir dhāp—100′ × 80′ × 30′
Mongolnather dhāp—100′ × 80′ × 10′
Narapotir dhāp—130′ × 100′ × 8′
Sanyasir dhāp—50′ × 50′ × 12′
Dolumajhir bhitā—80′ × 90′ × 6′
Dhanvantari—100′ × 80′ × 20′
Khamer—300′ × 200′ × 10′
Skanda dhap—150′ × 130′ × 15′
Gopinath bhitā—200′ × 250′ × 5′
Rāstala—100′ × 250 × 5′
Shashthitala—100′ × 90′ × 10′
Dhanbhandar—150′ × 100′ × 30′
Mound-I—60′ × 60′ × 7′
Mound-II—800′ × 750′ × 40′
Mound-III—300′ × 200′ × 6′

(P. C. Sen, 'Mahasthan and its Environs' Rajshahi 1929 থেকে সংগৃহীত তথ্য)।

মহাস্থানের অনতি দূরে পশ্চিমভাগে ভাসু বিহার নামক একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউ-এন-সাঙের তথ্য বিবরণ অনুযায়ী এখানে ৭০০ ভিক্ষু বাস করতেন। সঙ্ঘারামের নিকটে অশোকের নির্মিত একটি স্তূপেরও তিনি

উল্লেখ করেন। গৌতম বুদ্ধ এখানে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। ক্যানিংহাম এই মতকে সমর্থন করেন। মহাস্থানের নিকটে গোকুলের মেঢ় নামক স্থানে অপর একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, এখানকার ২৪ কোণবিশিষ্ট ১৭০টি কক্ষ যুক্ত স্তূপটি তৎকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্তূপের দক্ষিণপূর্ব কোণে মানুষ, জীবজন্তু, লতাপাতার চিত্রযুক্ত ৪ ফুট বিস্তৃত ২৫ ফুট উচ্চ সোপান আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এটি গুপ্তযুগের।

প্রাপ্ত লেখতে Nagara শব্দটি বর্তমান থাকায় এই অঞ্চলের নগরায়ণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। বাস্তবিকই যে এখানে একটি উন্নত নগর বসতি ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এখানকার প্রথম স্তরে Punch Mark Coin, Cast Coin, Northen Black polished ware এর উল্লেখ করা যায়, পরবর্তী স্তরে গুপ্ত যুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়ের প্রচুর প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। যার মধ্যে কারুকার্য করা বোতাম, কান, গলা, নাকের ধাতব অলঙ্কার, পোড়ামাটির ও পাথরের ভাস্কর্য, মার্বেল, গ্লাস, পোড়ামাটির খেলনা, ব্রোঞ্জ ও তামার অলঙ্কার, নীলকান্তমণি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে N. B. P.র অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এছাড়াও অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়কালের পাল যুগের বেশ কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। কেবলমাত্র দুর্গ বা কেল্লা নয় স্থায়ী বসতি ও ধর্মীয় কেন্দ্রেরও চিহ্ন বর্তমান। এখানকার বৈশিষ্ট্য হল, বৃহৎ অঞ্চলে বসতি, ধাতব সংস্কৃতির চিহ্ন, পালযুগের প্রাচুর্যপূর্ণ ধর্মীয় বসতি। মহাস্থান বা পুণ্ড্রনগর ছিল একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র ও এখানকার দুর্গটি ১৮০০০ ফুট × ১০০০ ফুট পরিধিযুক্ত ও পূর্ব দক্ষিণ উত্তর দিকে পরিখা ছিল। এবং এই সকল প্রত্নবস্তু পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। মহাস্থানগড় থেকে ১৯৩১ সালের ৩০শে মার্চ ব্রাহ্মী লেখযুক্ত একটি প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের আধিকর্তা শ্রীযুক্ত জি. সি. চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এটি সংগ্রহ করে বর্তমানে কলিকাতার Indian Museum-এ রাখা হয়েছে। এটি ৩½" × ২½" × ½" পরিমাপ বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত লেখ, এটি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত লেখের ছয় লাইনের উপরে আরো কয়েকটি লাইন ছিল মনে করা হয়। এর অক্ষরগুলি মৌর্য যুগের, এবং মৌর্য রাজসভায় ব্যবহৃত ভাষাযুক্ত। এর সাথে অশোকের চতুর্দশ রক এডিক্টের সাদৃশ্য আছে। এ লেখের দ্বিতীয় পঙক্তিতে "Sulakhite Pu[m]ḍanagalate" শব্দগুলি লিখিত আছে, যা সংস্কৃত

'Pundnagaratah' (পুণ্ড্রনগর) থেকে এসেছে। অপর একটি শব্দ Dhānyaṁ (Paddy) বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই লেখে Saṁvaṁgiyas অর্থাৎ গোষ্ঠীকে নির্দেশ করা হয়েছে। লেখের মূল শব্দগুলি হল

1. nena Sa[m*] [va*] Igiy[ā]naṁ [Galadanasa], Dumadina [mahā].
2. mate I Sulakhite Puḍanagalate I c [ta]ṁ
3. [ni*] Vahipayisati I Saṁva[ṁ*]giyānaṁ [cha di* he [tathā*]
4. [dhā*] niyaṁ I nivahisati I da [ṁ]g [ā*] tiyāy[j*] k[c] d[evā*].
5. [tiyā*][yi] kasi I Su-atiyāyika[si] Pi I gaṁda [kchi].
6. [dhāni*][yi] kchi esa kothāgale Kosam [bhara*]
7. [niye]. (Epigraphia Indica Vol—XXI এর তথ্য) এখানে [yi] kchi esa···bhāra লেখায় পণ্ডিতগণ kothagai = koshthagara granary এবং kosam = kosa = treasury অর্থ করেছেন, এবং gandaka অর্থে চারকড়িযুক্ত মুদ্রার কথা বলেছেন।

এবং yikchi এর পূর্বে dhāni যুক্ত করে dhañyakain করা হয়েছে। সম্পূর্ণ লেখ পঙ্‌ক্তিগুলির যে অর্থ ঐতিহাসিকগণ করেছেন তার বঙ্গানুবাদ করলে দেখা যায় মৌর্য যুগে পুণ্ড্রবর্ধন নগরের মহামাত্র দুর্ভিক্ষের সময়ে জনগণকে (Saṁvaṁgiyānaṁ) মুদ্রা এবং goladāna প্রদানের নির্দেশপ্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর দ্বারা মহাস্থান ও পুণ্ড্রনগরের মধ্যে নৈকট্য সম্পর্ক প্রমাণিত হয়, যা ক্যানিং পূর্বেই সমর্থন করেছেন। তার লেখতে বাসু বিহারের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। যা হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত Pan-ha-ja-tan-na (Pundravardhana) অঞ্চলের Po-ship-p'o বিহার। ক্যানিং-হামের মতে এই বিহারটি বর্তমানে গঙ্গার নিকবর্তী রাজমহলের পূর্ব দিকে ৬০০ লি বা ১০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা অবহিত হওয়া গেছে যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল দুর্ভিক্ষ কবলিত হতো, এবং সেই সময়ে রাজকোষ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা বিনাশর্তে অর্থ ও শস্য প্রদান করা হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়

(durbhikshé rāja bījā-bhaki- ōpagraham kritvanu—graham kuryāt. Durga—Sétu-karma vā bhakt—anugrahéna, bhakta-samvibhāgam vā). এখানে উল্লেখ্য, জনগণকে চালের পরিবর্তে ধান (বীজ) ও অর্থ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে প্রাচীনকালে নগরগুলি কোন একটি নদীর ধারে গড়ে উঠতো, এবং প্রায়শই নদীর বন্যায় নগর প্লাবিত হত। এবং এর থেকে উদ্ধারকল্পে ও পুনর নির্মাণের জন্যই উক্ত অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে উত্তর বাংলা অঞ্চলে মৌর্য শাসন ভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায় এই লেখের Samvamgiyas সম্পর্কে Samvajyis কথা বলা যায়। হিউ-এন-সাঙের টীকাকার Fu-li-Chi উত্তর ভারতে ছিল, এবং স্থানীয় অধিবাসীরা একে Sam-jo-Chi (Samvajyi) বলতেন। Samvajyi বা virjyi ছিল আটটি জাতীর সংঘ। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল Samvajyi রা। প্রথমে virjyi এবং পরে সংঘ তৈরী করে Samvamgiyas এ পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের vangas বলা হয়। মৎস ও রায়ুপুরাণে Bhuvana-Vinyāsā অধ্যায়ে Parvangas এবং Vangeyas দুটি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এই লেখ থেকে অনুমিত হয় যে Samvamgiyas-দের মূল কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর।

(প্রত্নসমীক্ষা ভলুম ১—৩ ও Epigaphia Indica থেকে সংগৃহীত তথ্য)।

রাজবাড়ী ডাঙ্গা প্রত্নসমীক্ষা

গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্বকালে কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঐতিহাসিকগণ কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্দেশ করেছেন বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়, এবং রাজবাড়ী ডাঙ্গা অঞ্চলে থেকে আবিষ্কৃত হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত "রক্তমৃত্তিকা" বিহার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে যা নিশ্চিত ভাবে কর্ণ-সুবর্ণের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রথম এই অঞ্চলে খনন কার্য শুরু হয়। নিকটবর্তী চিরুট গ্রামে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দুটি মাটির স্তূপ দেখতে

পান, এবং রাজবাড়ী ডাঙ্গা ও রাক্ষসী ডাঙ্গার ঢিপি দুটি Ancient Monument preservation Act-এর অধীনে আনা হয়। ১৯২৮-২৯ সালে প্রথম রাক্ষসী ডাঙ্গাতে খনন শুরু হয়, পরবর্তীকালে ১৯৬১-৬২ সালে রাজবাড়ী ডাঙ্গাতে উৎখনন করা হয়। রাজবাড়ী ডাঙ্গার মূল স্তূপটি বর্তমান যদুপুর গ্রামের নিকটে অবস্থিত। এই গ্রামটি ৮৪১-৭৩ একর ভূমি বিশিষ্ট এবং ভাগীরথী নদী এর ধার দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে ভাগীরথী নদী রাজবাড়ী ডাঙ্গার ১½ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাচীন বসতির অধিকাংশই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে চকচান্দ পাড়া চক মাতালিয়া, চর-ডাঙ্গা পাড়া চরম্বিদির পুরে নতুন বসতি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

রাজবাড়ী ডাঙ্গা অঞ্চলে প্রাপ্ত স্তূপগুলি থেকে এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে রাজকর্ণের একটি রাজপ্রাসাদ ছিল বলে মনে করেন। এখানকার আবিষ্কৃত ভগ্নরাজপ্রাসাদটি মঠ পরিবেষ্টিত, এটি সদর ও অন্দর দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর উত্তর দক্ষিণে দুটি স্তূপ অবস্থিত। এ দুটিকে রাজবাড়ী ডাঙ্গা-১ ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা-২ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১ নম্বর স্তূপে একটি "বোরজ" পাওয়া গেছে। রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপে দুটি প্রশস্ত রাজপথ আবিষ্কৃত হয়েছে (২৫' উচ্চ ৭০০' চওড়া ভূতল)। শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় এটিকে হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত অশোকের সময়কার স্তূপ বলে মনে করেন। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গাতে রাজার ঠাকুরবাড়ী ছিল বলে মনে করা হয়। এর অধিকাংশ অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, এই অঞ্চল থেকে একটি সোনার লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গেছে। এর ½ মাইল দক্ষিণ পূর্বে সন্ন্যাসীডাঙ্গা ও বেলতলাডাঙ্গাতে ২৫' ও ২৬' উচ্চতাযুক্ত দুটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাগীরথীর স্রোতধারায় এর অধিকাংশ অঞ্চল নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি বৌদ্ধমঠ ছিল বলে মনে করা হয়। শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে এই স্তূপই হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত রক্ত মৃত্তিকা বিহার, রাজবাড়ী ডাঙ্গার যমুনাতলাও ও ভীমকতলাও (জলাশয়) থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীনযুগের রেলিক আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৫৩ সালে লেয়ার্ড সাহেব এই তলাও থেকে একটি কালো পাথরের মহিষমর্দিনি মূর্তি আবিষ্কার করেন। এই অঞ্চল থেকে পুরাতন ইট, পাথরে স্তম্ভ পাওয়া গেছে, স্তূপের দুধারের রাস্তা থেকে ১৯৬১ সালের খননের সময়ে বেশ কিছু বালি পাথরের স্তম্ভ ও বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখানকার ভগ্ন পাথরের খণ্ডগুলির উপকার চিত্রগুলি দেখে পণ্ডিতগণ এগুলি দশম একাদশ শতাব্দীর বলে মন্তব্য করেন।

এই অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা কালে উইলফোর্ড সাহেব মন্তব্য করেন এটি শৈবদের ধর্মীয় স্থান ছিল, এবং এটি বর্তমানে "Harārpana" নামে পরিচিত, ভাগীরথীর স্রোতধারা এর অধিকাংশ অঞ্চল নদীগর্ভে নিয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত রায় মনে করেন যে ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গাতে একটি শিবমন্দির ছিল। তিনি যমুনা তলাওতেই এই ধরনের শৈব উপাসনা কেন্দ্রের কথা বলেছেন। অপরদিকে নিকটবর্তী চিরুট গ্রামে প্রাচীন বসতি কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজবাড়ী ডাঙ্গার নিকটে যদুপুরে (পূর্বদিকে) মাটি স্তূপের নীচ থেকে ইট নির্মিত স্থাপত্য ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পূর্বদিকে জলাশয় বরাবর সারিবদ্ধ ইটের তৈরী গৃহ কক্ষের অংশ পাওয়া গেছে। যদুপুর থেকে প্রাপ্ত পাথরের স্থাপত্য ভাস্কর্যগুলি এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে, এ ছাড়াও মাঝিরা গ্রাম থেকে স্তূপ ছড়ানো ইটের খণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং বেশ কিছু মন্দির স্থাপত্য পাওয়া গেছে প্রাচীন আমলের। এর ভেতরের অংশে বৃহৎ পাথরের খণ্ড, গৌরীপট্ট পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। চিরুট ষ্টেশন থেকে দুমাইল দূরে গোবিন্দ গ্রামে একটি বৃহৎ স্তূপের অংশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬২ সালে রাজবাড়ী ডাঙ্গা খনন কার্যের সময় এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে কারুকার্য করা মূর্তি ও জিনিষ পাওয়া গেছে। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলি রাজবাড়ী ডাঙ্গার তথা কর্ণসুবর্ণের ঐতিহাসিক সত্যতাকে প্রমাণ করে।

(তথ্য ও চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রী এস. দাসের "Rajbaridānga" এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের উপর রচিত তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে)।

কর্ণসুবর্ণ বা রাজবাড়ী ডাঙ্গা অঞ্চলে স্থায়ী বসতির প্রমাণ হিসাবে 'Boppaghasavata grant' এর কথা বলা যায়। এটি জয়নাগ কর্তৃক ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রদত্ত বলে মনে করা হয়। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বসতির কথা জানা যায়। কর্ণসুবর্ণ থেকে কিছু পোড়া শস্য পাওয়া গেছে, (Trenches C3 এবং D3) এখানকার শস্যভাণ্ডার থেকে তিন ধরনের চাল ও গম (উত্তর ভারতীয় প্রকৃভির) আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিষয়টি উক্ত অঞ্চলের

স্থায়ী বসতিকে প্রমাণ করে। অপর দিকে ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কর্ণসুবর্ণের ধারাবাহিক (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর) নগরায়ণের প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও, এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ঢিবি উচ্চভূমি এবং ধ্বংসাবশেষ কিছু পরিমাণে নগরবসতির প্রমাণ দেয়, বিশেষতঃ রাক্ষসীডাঙ্গা, রাজবাড়ী ডাঙ্গা এবং চিরুটের প্রত্নবস্তুগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। রাজবাড়ী ডাঙ্গায় তিনটি ঐতিহাসিক স্তর পাওয়া গেছে—

১. প্রথম স্তর (২য়-৩য়-৪র্থ-৫ম শতাব্দী)—মৃৎ-পাত্রের চিহ্ন খোদিত সীলের অনুপস্থিতি।

২. দ্বিতীয় স্তর (৫ম-৬ষ্ঠ,-৯ম-১০ম শতাব্দী)—উন্নত সাংস্কৃতিক চিহ্ন, খোদিত সীল, অন্যান্য প্রত্নবস্তু।

৩. তৃতীয় স্তর (৯ম-১০-১১শ-১২শ শতাব্দী)—সীলের অনুপস্থিতি, এবং অবক্ষয়ের পর্যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে মহাস্থানের মত রাজবাড়ী ডাঙ্গাও একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র এবং এখানকার বসতি কেন্দ্রগুলির অস্তিত্ব ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষতঃ রাজবাড়ীর নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব এই অঞ্চলটির ধর্মীয় কেন্দ্রের বিষয়টিকে প্রমাণিত করে। পরিশেষে বলা যায় যে কর্ণসুবর্ণ তথা রাজবাড়ী ডাঙ্গার প্রত্নক্ষেত্রটি প্রাচীনকালের বাংলার অপর একটি নগরক্ষেত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ করে।

জগজ্জীবনপুর

১৯৯০ সালে জগজ্জীবনপুর উৎখনন অঞ্চল থেকে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, বর্তমানে এটি মালদা জেলা সংগ্রহ শালায় আছে। এটি ৪.৪ সেমি উচ্চ ও ৩.৫ সেমি চওড়া এবং ১.৭৫ সেমি পুরু, ভূমিস্পর্শ ধ্যানরত বুদ্ধ পদ্মের উপর উপবিষ্ট, এবং মস্তক প্রভামণ্ডল যুক্ত, এর পৃষ্ঠভাগে 'এ ধম্মহেতু প্রভবা... মহাশ্রমণ' লেখাগুলি রয়েছে এটি একটি **Votive Image.** এরই সাথে পূর্বপাড়া গ্রামে এক বাসিন্দার গৃহ থেকে কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী এটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর একটি পঞ্চরথ সিংহাসনের

উপর বিশ্বপদ্মাসনে বুদ্ধ ধ্যানরত উপবিষ্ট, দুই পার্শ্বে বোধিসত্ত্বদ্বয়ের চিত্র, দুই পাশে দুটি ময়ূর ও বিদ্যাধর মূর্তি বর্তমান, এটি দশম একাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

এই অঞ্চলের তুলাভিটার ক্ষেত্রে একটি 'বিহার' আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বেশ কিছু পোড়া ইট ও কাদার তৈরী দেওয়াল পাওয়া গেছে। যার পরিমাপ ৩২ × ১৮ × ৬ সেমি., ২৮ × ২৬ × ৫ সেমি., ২৮ × ১৫ × ৬ সেমি., ২৩ × ১৭ × ৮ সেমি. এবং ১৭ × ৬ × ৬ সেমি। বিহারের কোণগুলি বর্গাকার ও ৩০ × ৩০ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট, উড়িষ্যার ললিতগিরি ও উদয়গিরি বিহারের ন্যায় এর নির্মাণ পদ্ধতি। পণ্ডিতদের মতে এটি নবম দশম শতাব্দীর, এর মেঝে ইট নির্মিত এবং ১.৭০ মিটার চওড়া পোড়া মাটির টালি দ্বারা নির্মিত পথ ছিল। এই পথের ২.৫০ মিটার দূরত্বে খুঁটির গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে, এর পূর্বদিকে ধাপযুক্ত সিঁড়ির চিহ্ন আছে। এছাড়াও উত্তর দিকে একটি স্তূপের অস্তিত্ব (বিতর্কিত) পাওয়া গেছে। তুলাভিটার দক্ষিণপূর্ব দিকে ভিক্ষুদের থাকার ঘরের প্রকোষ্ঠ-গুলির পরিমাপ ২.৬০ মিঃ × ২.৬০ মিটার, এর দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে কুলুঙ্গি আছে, এখানে ৩৫-৪০ সারি ইটের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রকোষ্ঠের মধ্যে ১.২৪ × ১.২৮ মিটার পরিমাপ যুক্ত দরজার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

এখানে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত খনন কার্যের ফলে মোট চারটি স্তর পাওয়া গেছে, প্রথম দিকের নীচের স্তর দুটি পলিমাটির। পরের স্তর দুটি ভর্তি করা; ১নং স্তরে ইটের দুরমুশ পেটানো মেঝে অবস্থিত, পলিমাটির স্তর দেখে স্বাভাবিক ভাবেই বন্যার বিষয়টি অনুমিত হয় এটিকে Sterile layer বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তুলাভিটা থেকে ১৯৯৬ সালে উৎখননের সময়ে একটি পোড়ামাটির সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সীলের নীচে দুটি পঙ্‌ক্তি আছে। যার পাঠোদ্ধার না হলেও শ্রীমতী দেবলামিত্রের (প্রাক্তন মহানির্দেশিকা, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ) মতে এটি দশম শতাব্দীর, তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষায় দশম শতাব্দীর লিপিতে "শ্রীবজ্রদেব কারিত নন্দদীর্ঘী বিহারীয় আর্য্য ভিক্ষু সংঘ (স্য)" লেখা আছে। এখানে লক্ষ্যণীয় নন্দদীঘি বিহারের নাথ এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এখানে 'নন্দদীঘি' নামে একটি জলাশয় আছে। এরই সাথে ব্রজদেব নামাঙ্কিত একটি সীলমোহরও পাওয়া গেছে, সম্ভবতঃ এটি কোন সঙ্ঘ ভিক্ষুর।

জগজ্জীবনপুর থেকে একাধিক মাটির ফলক পাওয়া গেছে, পণ্ডিতদের মতে এই পোড়ামাটির ফলকগুলি বিহারের গাত্রের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হত। বেশির ভাগই উত্তর পশ্চিম কোণের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে, এগুলি বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, এই ফলকগুলিতে সূর্য, বিদ্যাধর, গরুড়, শিব, গন্ধর্ব বোধিসত্ত, গণ, পদ্মের উপর স্থাপিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ, ছত্রধর, সিংহ, হরিণ, বানর, মহিষ, কিন্নর কিন্নরী ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত। এই মূর্তিগুলিতে শিল্পশৈলী উন্নতমানের। এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এগুলি হাতে তৈরী, এখানে ছাঁচ ব্যবহৃত হয়নি। এবং ব্যবহৃত মৃত্তিকা বালি ও অভ্র-মিশ্রিত, এই ফলকগুলির সাথে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ফলকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

তুলাভিটায় ১৯৯৬ সালে খননের প্রথম পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে একটি স্তূপ পাওয়া গেছে। এর পরিমাপ ১৯.৬৩ মিটার চওড়া ও ৩.৫ মিটার উচ্চ। স্তূপের ভিতর দক্ষিণ-পশ্চিম দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গি পাওয়া গেছে। এটি সম্ভবতঃ দুটি পর্যায়ে নির্মিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ দিকে একটি দরজা ছিল পরে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রীমতী দেবলা মিত্র অবশ্য এটিকে স্তূপের পরিবর্তে গোলাকার বুরুজ প্রকোষ্ঠ বলেছেন, এই ধরনের নক্‌শা বিহার বিক্রমশীল মহাবিহারে দেখা গেছে। এখানে খনন কার্যের সময়ে প্রচুর লতাপাতা, ফুল ও জ্যামিতিক নক্‌শা যুক্ত ইট পাওয়া গেছে (ইটের মাপ ২৮ × ২৩ × ৮ সে. মি., ৩২ × ২৪ × ৬ সে. মি.)।

জগজ্জীবনপুর থেকে বেশ কিছু লাল ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, বৃহৎ আকৃতির কিছু থালা এবং ঢাকনা ও হাতলযুক্ত কড়াই, ঘট কলসি পাওয়া গেছে। এই বস্তুগুলি স্থায়ী বসতির সাক্ষ্য বহন করে। অপর দিকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির পুঁতি, লোহা ও পোড়ামাটির চুড়ি, পরিমাপের বস্তু, পোড়ামাটির বল, দুরমুশ, খেলনা হাতি এবং লিপিযুক্ত মাটির পাত্রের ভগ্নাংশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।।উৎখননের সময়ে তুলাভিটার চতুপার্শ্বে একটি কৃত্রিম পরিখা ছিল। এর প্রকৃত কারণ এখনও বিতর্কিত বিষয়, বিহারের চারপাশে প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসন একাধারে যেরূপ বাংলার পালবংশীয় ইতিহাসকে নতুন পথে নিয়ে গেছে, অপর দিকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি এই অঞ্চলে প্রাচীন বসতি ও সংস্কৃতিকে স্বপ্রমাণিত করেছে।

[তথ্য : পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের রিপোর্ট ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত।]

পাহাড়পুর খনন কার্যের তথ্য

বর্তমান কলকাতা থেকে ১৮৯ মাইল উত্তরে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের বগুড়ার জামালগঞ্জের কাছে পাহাড়পুর অবস্থিত। কাশীনাথ নারায়ন ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডাকারের নেতৃত্বে এখানে খনন কার্য শুরু হয়। পরবর্তীকালে শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এখানে খনন কার্য করেন। তাঁর নেতৃত্বে খনন কার্য চলার সময়ে এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়। এটি পাল রাজা ধর্মপালের নির্মিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। সঙ্ঘারাম যুক্ত এই বিহারের চতুর্দিকের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য ৮২২ ফুট। এটি সমচতুর্ভুজ বিহার, ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বিহার, ১৮৯ টি কুঠরীযুক্ত, ৯২ টির মধ্যে উচ্চ পূজার বেদী স্থাপিত আছে। এছাড়াও এখানে পালপূর্ব যুগের স্থাপত্যও পাওয়া গেছে, এবং মহাবিহারের ৬৩টি মূর্তিফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির লেখ থেকে এই বিহার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া গেছে। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত ছিল, এর সু-উচ্চ চৈত্য গৃহ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রবেশ পথের শেষে একটি প্রশস্ত চত্বর— সম্ভবতঃ এখানে ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করতেন। এইভাবে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রদক্ষিণ পথের প্রাচীরে ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কাহিনীযুক্ত ফলক রয়েছে। একটি প্রস্তর ফলকে কনৌজের গুর্জর প্রতীহার বংশের রাজা, মহেন্দ্রপাল এই বিহারের সংস্কার করিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন (বর্তমানে জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনটি অনুযায়ী ইনি পালরাজ মহেন্দ্রপাল)। স্তূপের তৃতীয় তলে প্রদক্ষিণ পথের কেন্দ্রস্থলে একটি উন্মুক্ত স্থান আছে। ঐতিহাসিকদের মতে এর উপর একটি বৃহৎ শিখর ছিল। জাভার বিখ্যাত বরাবুদর মন্দির এই পদ্ধতিতে নির্মিত। বিহার গাত্রে যে সকল দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে বিহার গাত্রস্থিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিটি ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে মনে করা হয়। এছাড়াও চিত্রের অভ্যন্তরে প্রাণীগুলির পরিচিতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা এর স্থপতি বাঙ্গালী ছিলেন বলে মনে করেন। পাহাড়পুরের এই বস্তুগুলি গৌড় অঞ্চলের প্রাচীন উন্নত সংস্কৃতির সাক্ষ্য স্বরূপ।

ফারাক্কার প্রত্নবস্তু, (মুর্শিদাবাদ)

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কাতে একটি ইঞ্জিনিয়ারীং প্রজেক্ট খননের সময় বেশ কিছু প্রাচীন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। ১৯৭৬ সালে শ্রীযুক্ত পি. শচীদানন্দ ও তৎকালীন Directorate of Archaeology-র অধিকর্তা শ্রীসুধীন দে-র তত্ত্বাবধানে গঙ্গানদীর দক্ষিণভাগে ফারাক্কার Feeder Canal যেখানে মূল গঙ্গা নদীর মূল স্রোতের সাথে মিশেছে (গুমাই) সেই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান। উৎখনন অঞ্চলের Site I ও Site II অঞ্চলে মৌর্য থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ের ইট মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এখানকার প্রাচীন বসতি শুরু হয়েছিল dark alluvial clay থেকে, পরবর্তীকালে পুনরায় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথমভাগে নতুন করে বসতি গড়ে ওঠে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের (পশ্চিমবঙ্গ) প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রী ডি. কে. চক্রবর্তী এই অঞ্চলটিকে কজঙ্গল বলে মনে করেন। তিনি এই অঞ্চল থেকে প্রত্নবস্তুর সাথে Silver Punchmarked Coin' ও আবিষ্কার করেছেন। এই মুদ্রাগুলি সূর্য, চৈত্য স্তূমার, ঘোড়া, চক্রের চিত্রযুক্ত।

প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির তারিখ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এগুলির সাথে মঙ্গলকোট, রাজবাড়ী ডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ), তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, এবং হরিনারায়ণ পুরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন, যার থেকে অনুমান করা হয় যে এখানে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়ের প্রত্নবস্তু আছে। C_{14} এর সাহায্যে গুমাইতে (ফারাক্কা) প্রাক মধ্যযুগীয় প্রত্নবস্তু থেকে কাঠের যে নমুনা পাওয়া গেছে তার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় ৮০-৪০ শতক, (ডঃ শ্যামাদাস চ্যাটার্জী IACS Jadavpur Calcutta)। এখানকার শিল্পীরা হুইল চালিত যন্ত্র ও Pinholes ও Punch technique এর সাহায্যে পশু ও মানুষের মূর্তি করতেন, এখানকার ছাপযুক্ত খেলনাগুলি মঙ্গল কোটের কুষাণ যুগের মত। অবশ্য ছাপযুক্ত প্রত্নবস্তুর সংখ্যা এখানে কম পাওয়া গেছে। হস্তনির্মিত বস্তুতে পরিমাপ বোধের অভাব সুস্পষ্ট, এবং ভাঁজগুলি সুস্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে এখানকার মৃত্তিকা নির্মিত মাছটি উল্লেখযোগ্য, একটি পাত্রের উপর এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। লাল রঙের

মসৃণ মাটির এই মাছটি গোলাকার চক্ষুযুক্ত, মুখে কারুকার্য করা, গাত্র বিন্দুযুক্ত, উচ্চতা ১·৬ সে. মি. ভঙ্গ অবস্থায় এটি পাওয়া গেছে। এখানকার মৃৎপাত্রে চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক নক্সা (ত্রিকোণ, বৃত্ত) প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি মাতৃ-মূর্তিও এখান থেকে পাওয়া গেছে যেগুলির মুখমণ্ডলে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির বিশ্বাসের প্রভাব বর্তমান। এবং এগুলির পরিমাপ ৫·১ × ১০ × ৪ সে. মি. এগুলির হাত গর্তযুক্ত এবং গলায় হার পরিহিতা। এছাড়াও বেশ কিছু ছাঁচে ঢালা মৃৎপাত্র ও সমতল ভিতযুক্ত চক্র পাওয়া গেছে। এগুলির পশ্চাৎ ভাগ সমতল ও মসৃণ।

ফারাক্কা অঞ্চল থেকে পঞ্চাশটি (৫০টি) সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ পাত্র, ব্যবহার্য পাত্র, গামলা, ধূসর পাত্রের ডিশ, কালো মসৃণ পাত্র, একটি রেখাযুক্ত লাল পাত্র পাওয়া গেছে। কালো ও লাল পাত্রগুলির অস্তিত্ব এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে Chalcolithic অধিবাসীদের সংযোগকে নির্দেশ করে। লাল পালিশ করা পাত্রগুলি বিন্দু ও চক্র দ্বারা সুসজ্জিত, (পরিধি ০·১ সে. মি—০·৮ সে. মি.) কালো ডিশগুলির (৪·৫ সে. মি × ৮ পরিধি যুক্ত) সাথে তমলুকের মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য বর্তমান, এবং কলিকাতার বেহালা সংগ্রহশালায় রক্ষিত চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎপাত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়াও কলসি আকৃতির বেশ কিছু পাত্র পাওয়া গেছে। এগুলির উচ্চতা ১১·৭ সে. মি. ৬ সে. মি. ; এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র পাত্রগুলির উচ্চতা ৭·৬ সে. মি. ৪·১ সে. মি., মাঝারি আকৃতির পাত্রগুলির উচ্চতা ও আকৃতির মধ্যে কোন পরিমাপের ভারসাম্য নেই। এগুলি সম্ভবতঃ ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। পান পাত্রগুলি সরু গলাযুক্ত এবং ৩.৯ সে. মি. পরিধিযুক্ত, কিছু পাত্র নির্মাণ যন্ত্রও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে Site I এবং II থেকে। এই অঞ্চলটি মৃৎপাত্র শিল্প কারখানার অবস্থানকে প্রমাণ করে। ফারাক্কা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ডিশ, গামলা, নারী ও পুরুষের মূর্তি, বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত রূপার Punch marked coin পাওয়া গেছে, কয়েকটি নারী মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে যে গুলির চক্ষু গোলাকৃতি এবং গর্তযুক্ত ; এগুলির উচ্চতা ১১·৫ সে. মি.। ভঙ্গ-পুরুষ মূর্তিগুলির হাত পা খর্বাকৃত, পরিমাপ বিহীন, নাক, চোখ, বুক ও পেট গর্তযুক্ত উচ্চতা ১৫·৭ সে. মি.। শিশু কোলে একটি নারী মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে, এটি ধূসর রঙের মস্তকে পাখাযুক্ত, গলায় নক্সাযুক্ত হার, শিশুটি মাতৃদেহ সংলগ্ন এবং নারী মূর্তির

চোখ গর্তযুক্ত ও রেখা অঙ্কিত। এটির উচ্চতা ১৯ সে. মি.। অপর দেবী মূর্তিগুলির অধিকাংশই নক্সাযুক্ত গহনা পরিহিতা। এই সকল প্রত্নবস্তুগুলি মুর্শিদাবাদ তথা গৌড় জনপদ অঞ্চলের প্রাচীন বসতি কেন্দ্রের ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত লেখমালা

মহাস্থানগড় লেখ (মৌর্যযুগ)
হরাহা লেখ (ইশান বর্মণ)
কলাইকুরি সুলতানপুর (১ম কুমারগুপ্ত)
আফসাদ তাম্রশাসন (আদিত্য সেন)
ফরিদপুর তাম্রশাসন (গোপচন্দ্র)
মল্লসারুল তাম্রশাসন (গোপচন্দ্র)
ফরিদপুর তাম্রশাসন (ধর্মাদিত্য)
ঘুগরাহাটি তাম্রশাসন (সমাচারদেব)
এগরা তাম্রশাসন (শশাঙ্ক)
১ম মেদিনীপুর তাম্রশাসন (শশাঙ্ক)
২য় ,, ,, (শশাঙ্ক)
কৈলান তাম্রশাসন (শ্রীধারণ রাত)
খালিমপুর তাম্রশাসন (ধর্মপাল)
ঘোষবারা তাম্রশাসন (দেবপাল)
বাণগড় তাম্রশাসন (১ম মহীপাল)
সারনাথ শিলালেখ (১ম মহীপাল)
নালন্দা লেখ (,,)
তেত্রাবন লেখ (,,)
বেলোয়া লেখ (,,)
বাঘাউরা লেখ (,,)
ইমাদপুর লেখ (,,)
কুর্কিহার লেখ (,,)
নারায়ণপুর লেখ (,,)
ভাগলপুর তাম্রশাসন (নারায়ণ পাল)
বাদল গরুড় স্তম্ভলেখ (নারায়ণ পাল)
মূর্তি-শিবের বাণগড় প্রশস্তি (নয়পাল)

জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন (মহেন্দ্রপাল)

দেওপাড়া মন্দির লেখ (বিজয় সেন)

পাইকোড় তাম্রশাসন (বিজয় সেন)

ব্যারাকপুর তাম্রশাসন (বিজয় সেন)

নৈহাটি তাম্রশাসন (বল্লালসেন)

সানোখা তাম্রশাসন (বল্লাল সেন)

আনুলিয়া তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

চণ্ডীমূর্তি লেখ (লক্ষ্মণ সেন)

মাধাইনগর তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

রামবাড়ি তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

শক্তিপুর তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

সুন্দরবন তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

তর্পণদীঘি তাম্রশাসন (লক্ষ্মণ সেন)

মদনপাড়া তাম্রশাসন (বিশ্বরূপ সেন)

গ্রন্থপঞ্জী

মূল উপাদান ঃ লেখ—

Fleet, J.F., *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol-III, Varanasi, 1963.

Gupta, K., *Copper Plates of Sylhet*, Sylhet, 1967.

Majumder, W. G., *Inscription of Bengal*, Vol-III Rajshahi, 1929.

Majumder, N. G., *Inscription of Bengal*, Rajshahi, 1929.

Mukherjee, R. K. and Maity, S. K. (ed) *Corpus of Bengal Inscriptions*, Calcutta, 1967.

Sircar, D. C., *Select Inscriptions bearing on Indian History, and Civilization*, Vol-I, Calcutta, 1965, Vol-II, Delhi, 1989.

: *Indian Epigraphical Glossary*, Delhi, 1966.

: *Indian Epigraphy*, Delhi, 1965.

: *Epigraphical Discoveries in East Pakistan*, Cal. 1973.

ভট্টাচার্য, পদ্মনাভ, **কামরূপ শাসনাবলী**, রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৮।

মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, **গৌড় লেখ মালা**, রাজশাহী, ১৯১২।

সরকার, দীনেশচন্দ্র, **শিলালেখ তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ**, কলিকাতা ১৯৮১।

প্রত্নতত্ত্ব ঃ

Das. S. R., *Rājbādidāṅgā*, Calcutta, 1968.

: *Archaeo'ogical discoveries from Murshidabad*, Cal-1971.

Dikshit, K. N., *Excavations at Pāhārpur*, Archaeological Survey of India, Memoir, No. 55, 1938.

Ghosh, Amalananda, *An Encyclopaedia of Indian Archaeology*, Vol. II, Delhi, 1989.

Goswami, K. G., Excavations at Bāngarh (1938-41), Ashutosh Museum, Memoir No.-I.

Khan, F. A., *Maināmoti*, Karachi, 1963.

Khan, Abid Ali, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta.

Sen, P. C., *Mahāsthān and its Environs*, Rajshahi, 1929.

যাকারিয়া, আবুল কালাম মহম্মদ, **বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ**, ঢাকা, ১৯৮৪।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য :

Aitereya Brāhmaṇa, Trans by., A. B. Keeth, H.O.S, Vol-XVV, Cambridge, 1924.

Achārānga Sūtra, Eng. Trans. H. Jacobi, Oxford, 1892.

Aṅguttara Nikāya, Ed. R. Morris and E. Hardy, London 1885-1900.

Arthaśāstra of Kauṭily, Trans. R. Sharmasastry, 6th Ed. Mysore, 1960, Trans. by R. P. Kongle, Bombay, 1960 and 1963.

Arya-mañju-sri-mūla-kalpa, Text ed. by T. Ganapati Śāstri, Sanskrit Series, No. LXX. Trivendrum, 1920.

Ashṭādhyāyī, of Pāṇini, Ed. and Trans. S.C. Basu, Delhi, 1962

Adbhuta Sāgara, Ed. M. Tha, Benaras, 1905.

Bhāgavata Purāṇa Eng. Trans, M. N. Dutt, Calcutta, 1895.

Bhavishya Purāṇa, Venktesvara Press, Bombay, 1910.

Brāhma Purāṇa, Poona, 1895.

Baudhāyana Dharmasutra, S. B. E. XIV, Oxford, 1882.

Brihat saṁhitā of Varāhamihira, Ed. H. Kern, Calcutta 1865.

Brāhmaṇa Sarvasva of Halayudha, Ed. T. Vidyanandan, Calcutta, 1924.

Daśakumāracharita of Dandin, Eng. Trans. N. R. Kale, Bombay, 1928.

Dighanikaya, Trans. T. W. Rhys Davids. S. B. B. 3 vols, London, 1889, 1910, 1921.

Gaudovaha of Vakpatiraja, ed. N. B. Utgikar, Nasik, 1927.

Harsacharita of Banabhatta. ed. A. Fuhrer, Bombay, 1929.

Kāmasutra of Vatsya Yana, ed. Damodar Goswami, Benaras

Kathasarit Sagara of Somadeva, Trans. C. H. Tawney, Cal., 1880-87.

Kurma Purāṇa, Puna, 1907.

Kāvyadarsa of Dandin, Eng. Trans. S.K. Belvalkar, Puna, 1924

Linga Purāṇa, Ed. J. Vidyasagar, Calcutta, 1885.

Mahābhārata, Eng. Trans. K. M. Ganguly, Published by P. C. Roy, Calcutta, 1884-96.

Matsya Purāṇa, Puna, 1907.

Manu Somhita, Eng. Trans. G. Buhler, Oxford, 1886.

Milindapanho, Eng. Trans. T. W. Rihys Davids, Oxford, 1890-94.

Nitisāra of Kāmandaka, Ed. R. Mitra, Calcutta, 1884.

Padma Purāṇa, Ed. V.N. Maudalik, Puna, 1893-94.

Pavanaduta of Dhoyi, ed., C. Chakraborti, Calcutta, 1924.

Prabodhachandradaya of Krishna Misra, ed. V. L. Panni, Bombay, 1924.

Rigveda, Ed., R. T. H. Grifith, Varanasi, 1986-97.

Rājatarangini of Kalhana, Ed. M.A. Stein, London, 1 961.

Rāmāyana Eng. Trans. M. N. Dutt, Calcutta, 1892-94.

Raghuvamsa, of Kalidasa Eng. Trans., G. R. Nandargikar, Bombay, 1897.

Saduktikarnāmṛita, ed. R. Sharma, Calcutta, 1921.

Śaktiśamgamatantra, Gaikoard Oriental Series. Vol-IV.

Udaya Sundari Kathā of Soḍḍhala, ed. C. D. Dalal and E. Krishnamacharya, Barada, 1920.

বল্লালসেনের **দানসাগর**, বাংলা অনুবাদ, এস. সি. কবির, কলিকাতা, ১৯১৪-১৯১৯।

সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত**, রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত, কলিকাতা ১৯০০।

বৈদেশিক বিবরণাদি ঃ

চৈনিক ঃ

Beal. S. ; *Si-yu-ki*, Buddhist Records of the Western World, Trans. from the Chinese of Hieun-Tsang, New Ed. Calcutta, 1958.

Legge, J. A., *Travels of Fahien*, Oriental Publishers, Delhi, 1971.

Takakusu, J. A., A *Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malaya Archipelago by I-tsing*, Delhi, 1966.

Ta-Si-Yan, *She Kia-Fang-Che*, 2 vols. Trans. by Davids and S. W. Bushett, London, 1904, 1905.

Watters, T., *On Yuan Chwang's Travels in India*, 2 vols. London, 1905.

তিব্বতী ঃ

Lama Taranatha, *History of Buddhism in India*, Ed. Debi Prosad Chattopadhyay. Trans. Aloka Chattopadhyay, 1st ed. 1970.

মুসলিম ঃ

Ain-I-Akbari of Abul Fajal Ed. H. Blochmann, Calcutta 1868-94.

Alburuni's India, Eng. Trans. E. Sachau, 2 Vols. London, 1910

Taba Kat-i-Nāsiri of Minhāj-Ud-din, Eng. Trans. H. G. Raverty, Calcutta, 1873-97.

অধুনিক গবেষণা গ্রন্থাদি ঃ

Ahmed Nazimuddin, *Mahāsthān*, Dacca, 1975.

Bose, M., *The late classical Age*, Calcutta 1889.

Banerjee, R. D., *History of Orissa*, Vol-I, Calcutta, 1930-31.

The Origin of the Bengali Script, Calcutta, 1973.

Barua, K.L., *Early History of Kamrupa*, Vol-I, Shillong, 1933.

Basak. R. G., *History of North Eastern India*, Sambodhi, Ed. Calcutta, 1967.

Chowdhury Abdul Momin, *Dynastic History of Bengal*, Dacca, 1967.

Bhattacharya, A., *Historical Geography of Ancient and Medieval* Bengal, Calcutta, 1977.

Chakladar, H. C., *Social Life in Ancient India*, Delhi, 1984.
Chattopadhyay, Bhaskar, (ed) *Culture of Bengal Through the Ages*, Calcutta, 1986.
Chattopadhyay, S., *Early History of Northern India*, Calcutta, 1968.
Chattopadhyay, S. K., *The Origin and Development of Bengali Language*, 2 vols. Calcutta, 1926.
Crighton, H., *The Ruins of Gour* : Described and represented in eighteen views with topographical map, 1817.
Chaudhuri, A. M., *Dynastic History of Bengal*, Dacca, 1967.
Chaudhuri, S. B., *Ethnic Se:tlements in Ancient India*, Calcutta, 1955.
Cunningham, A., *Ancient Geography of India*, *Benaras*, 1963.
Dani, A. H., *Indian Palaeography*, Oxford, 1963.
Dey, N. L., *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971.
Ganguly, D. K., *Historical Geography and Dynastic History of Orissa*, Calcutta, 1975.
Ghosh, A., *The City in Early Historical India*, Simla, 1973.
Gupta, Paramananda, *Geography in Ancient Indian Inscriptions*, Delhi, 1973.
Hazra, R. C., "The Purānas", *Cultural Heritage of India*, Vol. II, Calcutta, 1969.
Hunter, W. W., *Statistical Account of Bengal*, Vol. XX, London, 1975-1977.
Law, B.C., *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1967.
Majumdar, R. C., (Ed). *History of Bengal*, Vol. I. Dacca, 1943.
History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971.
The Classical Age, Bombay, 1962.
The Age of Imperial Kanauj, Bombay, 1964.
The Struggle for Empire, Bombay, 1979.
Majumder, S. C., *Rivers of Bengal*, Delhi, 1941.

Majumder, B. P., *The Socio-Economic History of Northern India*, Calcutta, 1960.

Misra. B., *Dynasties of Medieval Orissa*, Calcutta, 1933.

Morrison, B. M., *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*, Arizona, 1970.

Mukherjee, R. K., *Changing Face of Bengal*, Calcutta University.

Mukherjee, B. N. and Bhattachariya, P. K. (ed), *Early Historical Perspective of North Bengal*, Derjeeling, 1987.

Maitra, A. K., *The Ancient Monuments of Varendra (N. Bengal)* Calcutta, 1979.

: *The Fall of Pala Empire*, Calcutta, 1987.

Niogi, P., *Contribution to the Economic History of Northern India*, Calcutta, 1962.

Ravenshaw, James H., *Gour, its Ruins and Inscriptions, Ed. by Mrs., Ravenshaw*, 1878.

Renell, J., *Memoirs of A Map of Hindusthans*, London, 1783.

Ray, Amita, *Urbanization in Bengal*, Goa, 1987.

Roy, H. C., *Dynastic History of Northern India*, Vol-I, Calcutta, 1931.

Roychoudhury, H. C., *Studies in Indian Antiquities*, Calcutta, 1942.

Saraswati, S. K., *Architecture of Bengal*, 1976.

Sen, B. C., *Some Historical Aspects of the Inscription of Bengal*, University of Calcutta, 1942.

Sharma, R. S., *Material Culture and Social Formations in Ancient India*, Delhi, 1983.

Sinha, B. P., *Dynastic History of Magadha*, Delhi, 1977.

Sircar, D. C., *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1971.

Cosmography and Geography in Early Indian Literature, Calcutta, 1971.

Stewart, Charles, *The History of Bengal*, 1913.

Thakur, B., *Urban Settlement in Eastern India*, Delhi 1980.
Thakur, V. K., *Urbanisation in Ancient India*, Delhi, 1921.
Thakur, U., *History of Mithila*, Darbhanga, 1956.
Valentine W. H., *The Copper Coins of India*, Reproduced, 1995.

বাংলায় ঃ

আচার্য, বিষ্ণুদাস—**শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**, ২য় সং, ১৯৮৩।
করিম, আবদুল—**বাংলার ইতিহাস**, সুলতানী আমল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭।
গুপ্তা, পরমেশ্বরীলাল—**ভারতের মুদ্রা**, ১৯৮৪।
ঘোষ, প্রদ্যোত—**গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য**, ১ম পর্ব, ১৯৭৩।
ঘোষ, শৈলেন্দ্রকুমার—**গৌড় কাহিনী**, কলিকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
দাস, গৌড়—**গৌড় দেশের কথা**, কলিকাতা, ১৯৬৪।
চক্রবর্তী, রজনীকান্ত—**গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার—**বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভুমিকা**, কলিকাতা, ১৯৬৮।
সাংস্কৃতিকী, কলিকাতা, ১৯৪৪।
চন্দ, রমাপ্রসাদ—**গৌড়রাজমালা**, রাজশাহী, ১৯১৯।
বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ—**ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা**, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস—**বাঙালীর ইতিহাস**, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪।
বসু, এন. এল.—**বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস**, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২১।
(সম্পা.) **বিশ্বকোষ**, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩০৩।
মিত্র, চারুচন্দ্র—**গৌড় পাণ্ডুয়া**, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ।
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার—**গৌড়ের কথা**, ১৩৯০।
রায়, নীহাররঞ্জন—**বাঙালীর ইতিহাস**, আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬।
রহিম, আবদুল—**বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস**, ১৯৯৫।
সরকার, দীনেশ চন্দ্র—**পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত**, কলিকাতা, ১৯৮৫।
পাল সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২।
সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১।
শিলালেখ তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৮১।
সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ—**হিউ-এন-সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধভারত**, ১৯৮৮।
সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল—**প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়**, ১৯৭৬।
সেন, প্রভাস—**বাংলার ইতিহাস**, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮।

বঙ্গ ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪।

সেন, দীনেশচন্দ্র—বৃহৎবঙ্গ, কলিকাতা।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী।

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (নির্বাচিত):

Basak, R. G., 'Five Damadarpur Copper-plate Inscriptions', *EP. Ind.* IV.

Bagchi, P. C., 'Materials for a Critical Edition of the Charyā-Padas'. *Journal of the Department of Letters*, Calcutta University XXX.

Bhattachariya S. P., 'The Gauḍ Riti in Theory and Practice', *IHQ*, Vol-III, No. 2, 1927.

Beveridge, H., Notes on Major Franchen's Description of Gour in the Journal of Asiatic Society of Bengal, LXIII, 1894.

Bolton, C. W., Annual Address : Notes on Gour and Pandua, Proceeding of the ASB, 1903.

Bhowmick, A. C., Chemical preservation of Bronge objects of Malda Museum. (প্রত্নসমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ, ভলুম ২-৩)

Bhattacharya, G., The new Pala Ruler Mahendrapala (প্রত্ন-সমীক্ষা)

Banerjee, Tapas, Antiquities from Farakka, Murshidabad, in the Collection of State Archaeology Museum (W.B.) (প্রত্নসমীক্ষা ভলুম ২-৩)

Bakshi. Ilahi, Archaeological Report on Gour, 1902.

Chakroborti, Monmohan, 'Notes on the Geography of old Bengal' *JASB* (N.S.) IV, Part-I.

'Notes on Gaur and other old places in Bengal', *JASB*, 1909.

Chatterjee, Ratnabali : Gour and Pandua. (প্রত্নসমীক্ষা ভলুম ২-৩)

Chattopadhyay, B. D. : Urban Centres in ealy Bengal, Archaeological perspectives. (প্রত্নসমীক্ষা, ২-৩)

Chakroborty, Dilip : A note on the use of metals in Ancient Bengal. (প্রত্নসমীক্ষা ২-৩)

Cunningham, A : Archaeological Survey Report, Vol X, 1888, 1871-72, Vol-III, 1879-80, Vol XV.

Dikshit, K. N. : Excavation in Bengal, Annual Report of Archaeological Survey of India, 1928-29, Delhi, 1933.

De, Sudhin : Excavation at Jagagibanpur (প্রত্নসমীক্ষা ২-৩)

Ganguly, D. S., 'Political Condition of Bengal during Hiuen-tsang's visit', *I.H.Q.* XII.

Ghosal, U. N. and, Dutta, N. : Tārānātha's History of Buddhism in India, I.H.Q. VI.

Goswami, N. : Archaeological Activities in Bengal till 1967. (প্রত্নসমীক্ষা ভলুম ২-৩)

Hamilton, Buchanan, Geographical Statistical and Historical description of the District of Zilla of Dinajpur (JAS. 1833)

Jain, H. L. 'The Chief Political Divisions of India during the eighth Century, *I.C.* XI.

Lambour, G. E., Bengal District Gazetteer Malda, 1918.

Major W. Francklin, Journal of the route from Rajmohal to Gour, 1810-11, Shillong.

Majumder, R. C. ; 'A Note on King Gopachandra of Bengal', *JAS*, XIII, Nos. 1-4.

Mukherjee, B. M., East Indian Khorosthi (unpublished) Khorosthis and Khorosthi Brāhmi Inscription in West Bengal, Calcutta, 1990.

Inscribed porcelain Sheds from Gour and Saptagrama (প্রত্নসমীক্ষা ভলুম ২-৩)

Mukherjee, S.C., The Three recently discovered copper plates of Pāla Period. (প্রত্নসমীক্ষা ভল্যুম ১)

Poul, Pramod Lal : 'The Gauḍas and Gauḍā', *I.H.Q* XIII.

Pargiter, F. E. : 'Ancient Countries in Eastern India', *JASB*, L. *XVI*.

Qadir, M. A., The newly discovered Malda at Gaur and its inscriptions in Journal of ASB, Dacca, 1979-81.

Roychoudhuri, H. C. ; 'The Gupta Empire in the Sixth and Seventh Centuries A.D.', *JPASB* (N.S.) XVI.

Saraswaati, S. K, Forgotten cities of Bengal, *Calcutta Geographical Review*, 1938.

Sarkar, S. C., 'Notes on a Tibetan Account of Bengal', *JBORS*, XIX.

Sastri, H. P., 'Literary History of the Pala Period', *JBORS*, V.

Sen, P. C., 'Some Janapadas of Ancient Rāḍha', *I.H.Q.* VIII.
'Puṇḍravardhana'—its site, *I.H.Q*, IX.

Sen, B. C., 'Administration in Pāla Bengal', *I.C.* VI.
'Administration in Under the Pālas and the Seno', *I.C.* VII.

Sinha, B. P., Śaśāṅka', *JBRS*, XXXV.

Sinha, R. L., (ed) : India, A Regional Geography, Varanasi, 1987.

Sengupta, Gautam : Pala terracotta findings from North Bengal. (প্রত্নসমীক্ষা ভল্যুম-১)

Sircar, D. C. : Gauḍa-Kāmarūpa struggle in the sixth and seventh centuries *A. D.*, *I. H. Q.* XXVI.

নির্ঘণ্ট

চ

জ

ত

দ

ন

প

ব

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১১	জুইটলের	গুইটলের
২০	৪	গৌর	পৌর
২১	৪	যুদ্ধবদ্ধ	যুদ্ধবত
২৭	৫	বিভিন্ন মূলথেকে	বিভিন্ন মূলত প্রাপ্ত
৩৪	২৭	ন	নয়
৩৮	১৯	বদ্র	রুদ্র
৩৮	২৭	মোড়ল	সোড়ল
৫৩	১৭	শ্রাবন্তী	শ্রাবস্তী
৫৩	২১	”	”
৫৭	৩	”	”
৫৭	২৯	আমন্ত্রণে	আমন্ত্রণে
৫৮	২৪	কারণে যে	কারণে বলা যায় যে
৫৯	২৩	শ্রাবন্তী	শ্রাবস্তী
৮৩	২৭	নাথ	নাম
৮৪	১৬	বিহার	বিহারের

● গৌড় নগরীর অবস্থানের পরিবর্তন কেন্দ্র
■ উৎখনন কেন্দ্র
কিলোমিটার
তী র ভু ক্তি
গঙ্গা
ভাগলপুর
রাজমহল
লক্ষ্মণাবতী
গৌড়
রামাবতী
পুণ্ড্রনগর
পাহাড়পুর
মহাস্থান
বিজয় পুর
মুর্শিদাবাদ
পদ্মা
কর্ণ-সুবর্ণ
ময়ূরাক্ষী
অজয়
ভাগীরথী
নবদ্বীপ
রূপনারায়ণ
সরস্বতী
ব্রহ্মপুত্র
মেঘনা
ঢাকা
বঙ্গোপসাগর
৩০°
২৮°
২৬°
২৪°
২২°
৮৬°
৮৮°
৯০°
৯২°

পাতাল
চণ্ডীর ঘাট
ফুলবাড়ী
রামকেলী
বড়সোনা মসজিদ
দাখিল গেট
মহদীপুর
খরসাবাড়ী
ভোলা ও দীঘি
ভাগীরথী নদী
ছোটসোনা মসজিদ
বর্তমান গৌড়
স্কেল ১ ইঞ্চি = ২ মাইল

প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ
কিলোমিটার
উত্তররাঢ়া
দক্ষিণরাঢ়া
বর্ধমান
মুর্শিদাবাদ
নবদ্বীপ
ঢাকা
চট্টগ্রাম
দণ্ডভুক্তি
তাম্রলিপ্তি
পদ্মা
চন্দ্রদ্বীপ
বিক্রমপুর
সুবর্ণগ্রাম
ভাগলপুর
পূর্ব সাগর
(বঙ্গোপসাগর)
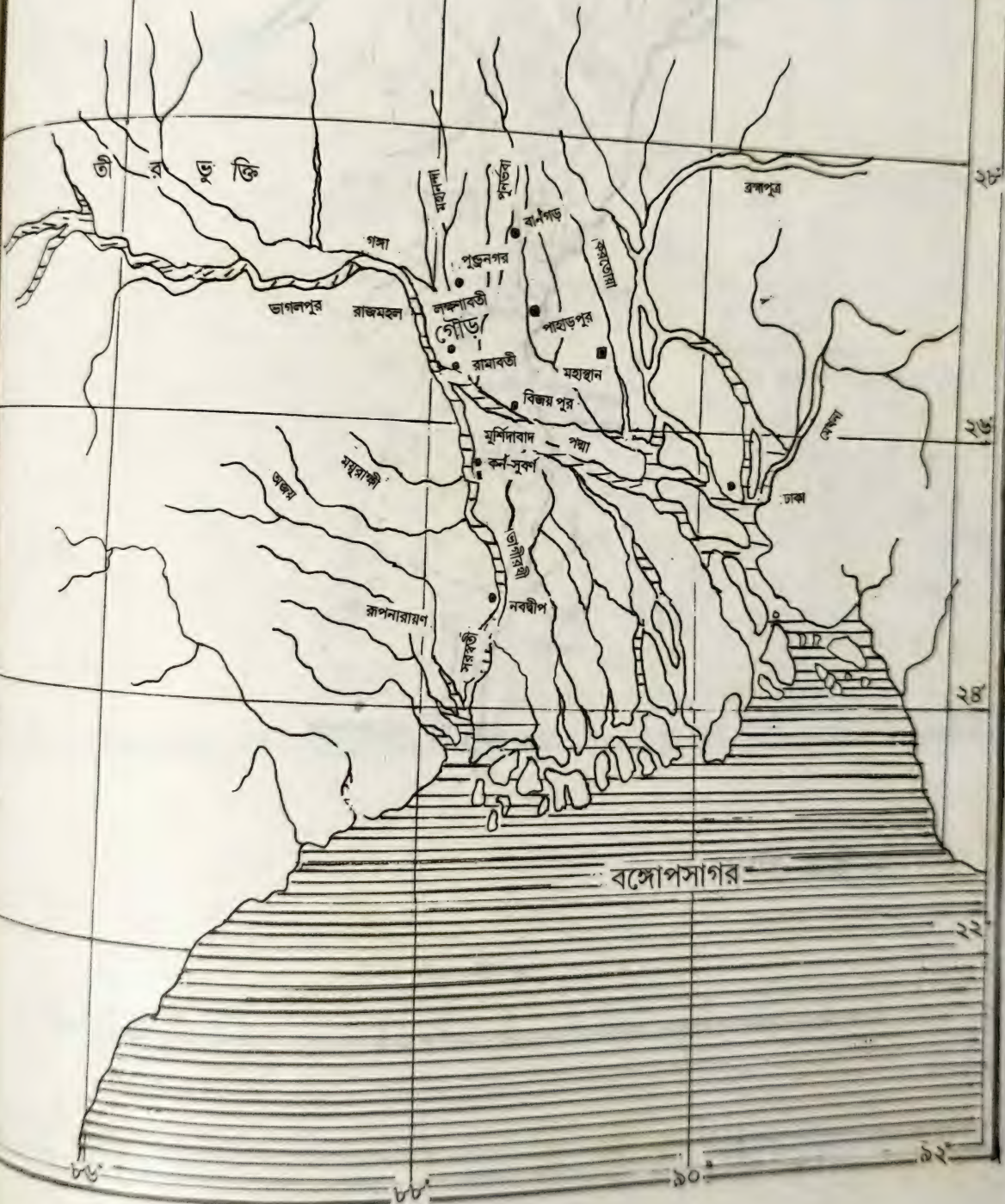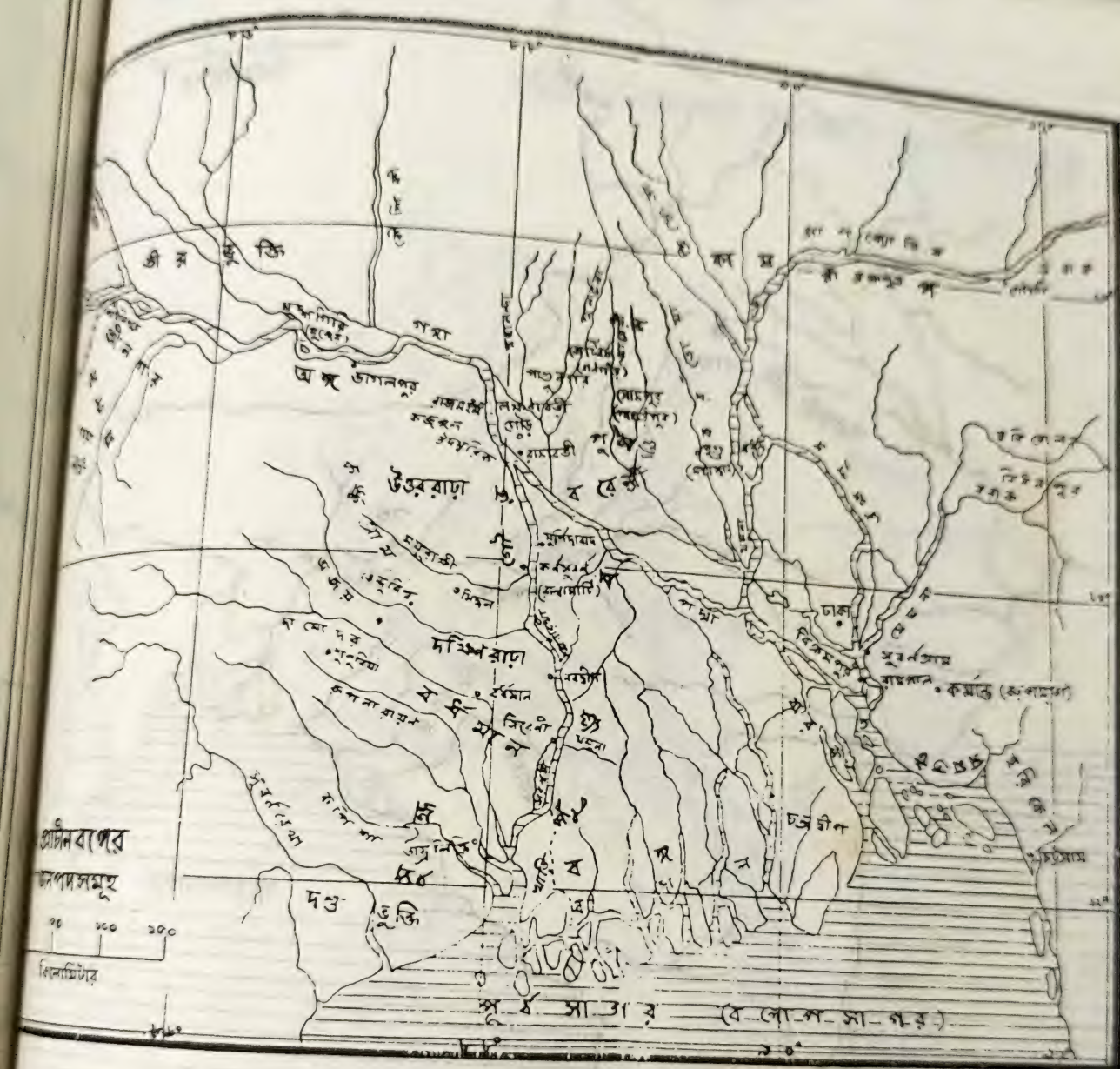
পঞ্চ গৌড় অঞ্চল
০
৫০
১০০
১৫০
কিলোমিটার
সারস্বত
সরস্বতী নদী
গঙ্গা
কান্যকুব্জ
মিথিলা
গৌড়
উৎকল
মহানদী
বঙ্গোপসাগর
কাবেরী
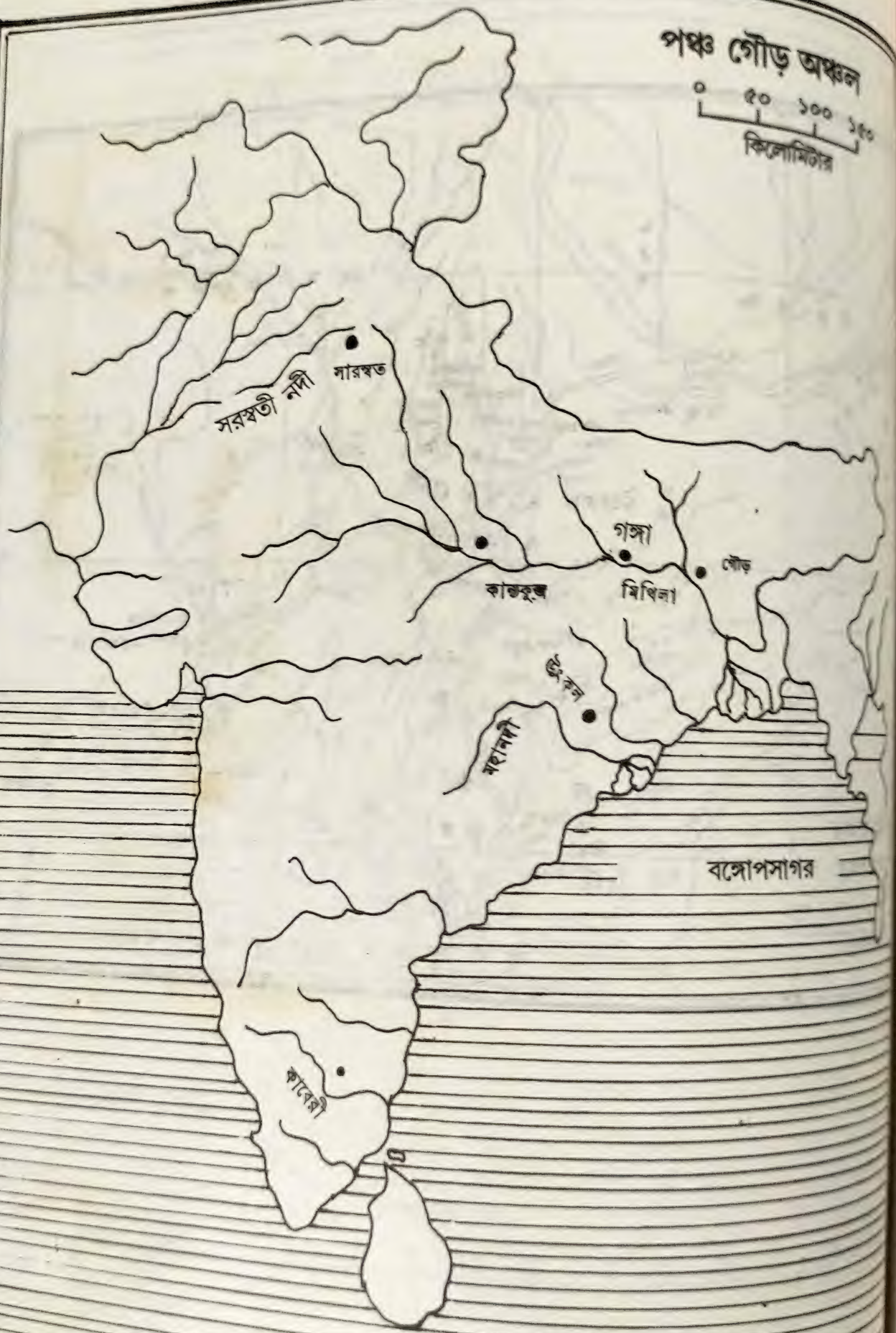
প্রাচীন বাংলার উৎখনন ও নগরকেন্দ্র
বানগড়
পাহাড়পুর
জগজ্জীবনপুর
মহাস্থান
আসাম
বাংলাদেশ
পদ্মা
কর্ণ-সুবর্ণ
রাজবাড়ীডাঙ্গা
বঙ্গোপসাগর

বানগড় খনন ক্ষেত্র

জেলা ঃ- পশ্চিম দিনাজপুর

বিভাগ ক, খ

ব্লক ১

ব্লক ২

বিভাগ খ

বিভাগ ক

পাথর

১ স্তর

২ স্তর

— ভূতল পরিকল্পনা —
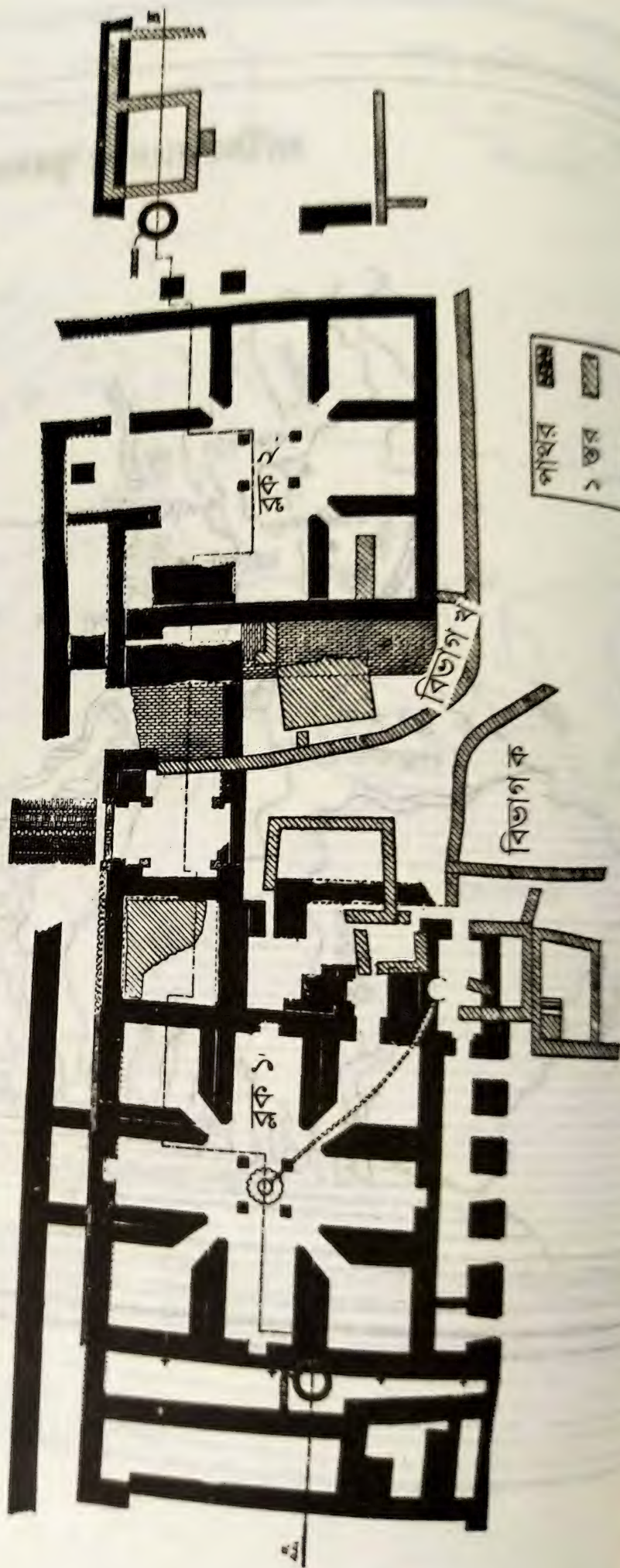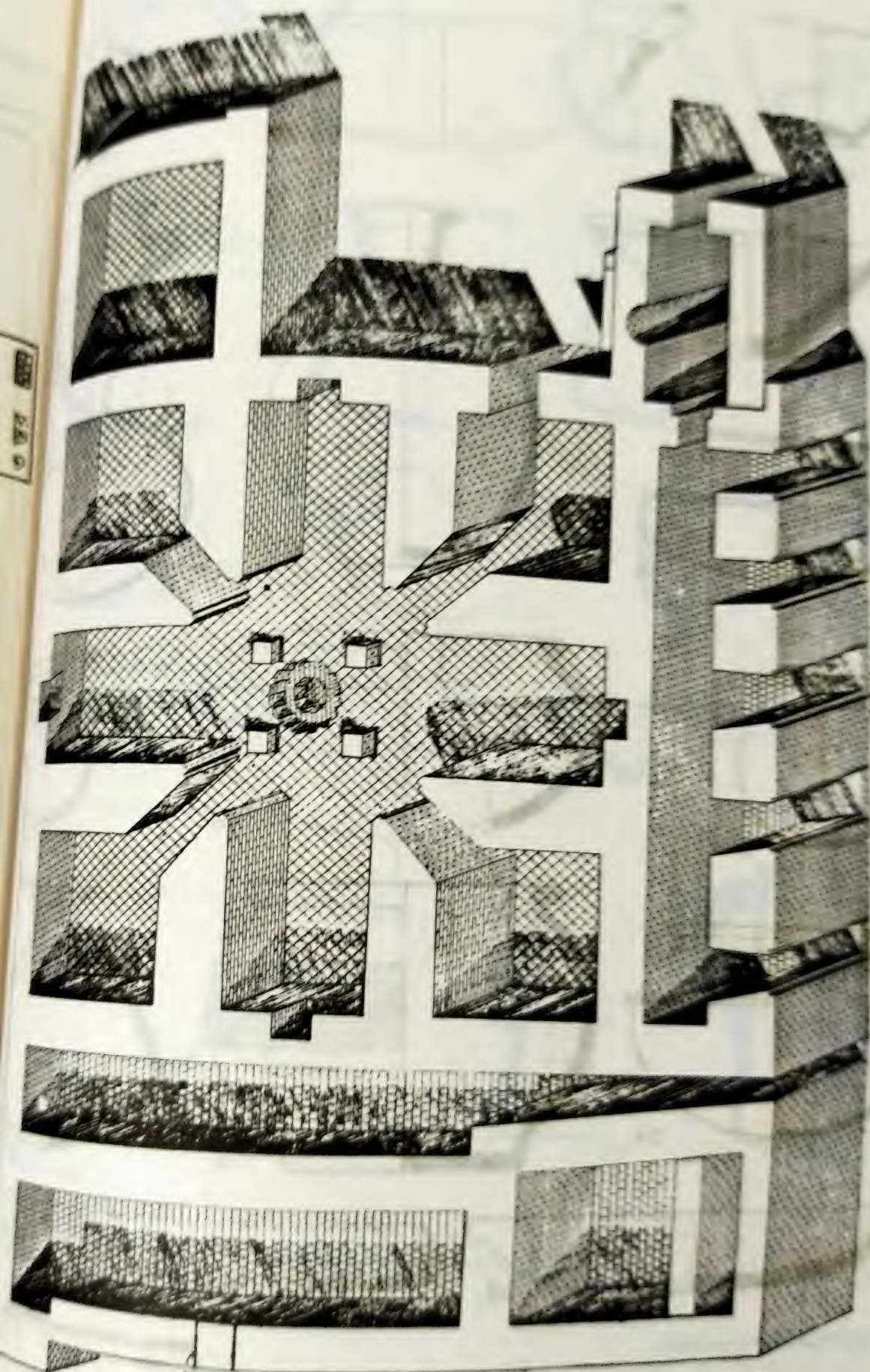
তির্যকক্ষেত্র পরিকল্পনা
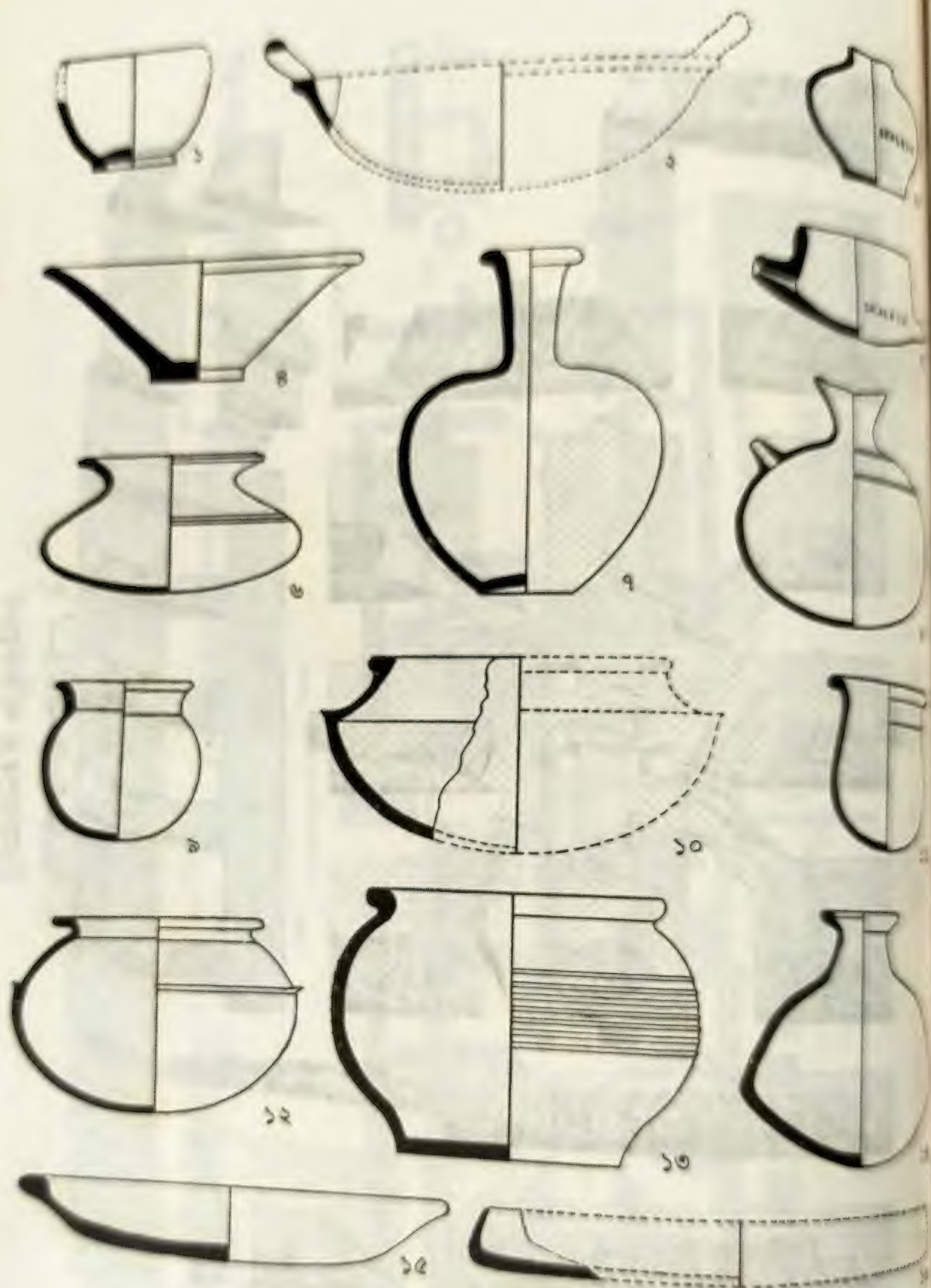
বানগড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্র

বানগড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্র

মুর্শিদাবাদ জেলা
গঙ্গা ভাগীরথীর ধারা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা খননক্ষেত্র
০ ২ ৪
মাইল
রাজশাহী
পদ্মা
রাজবাড়ী ডাঙা
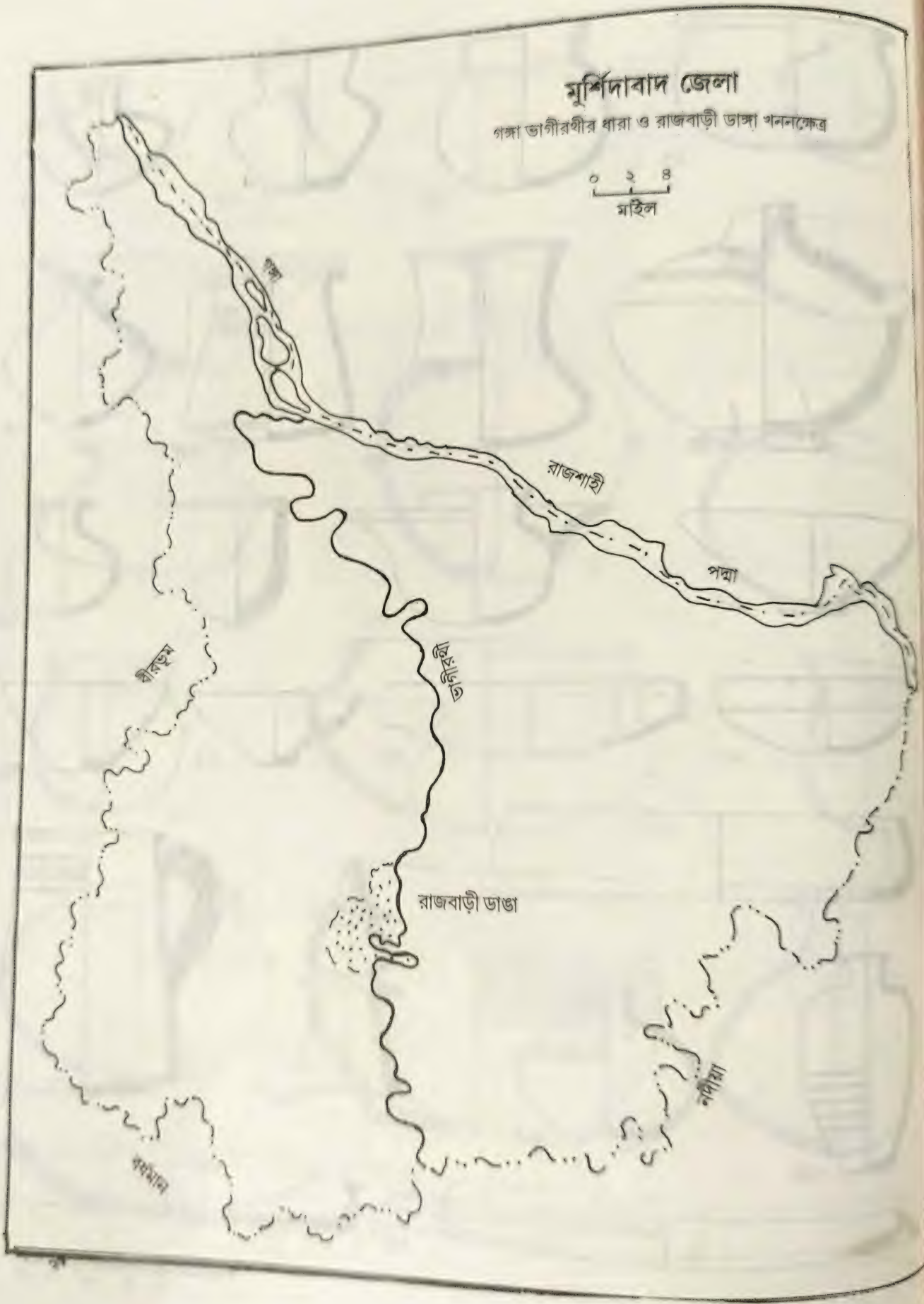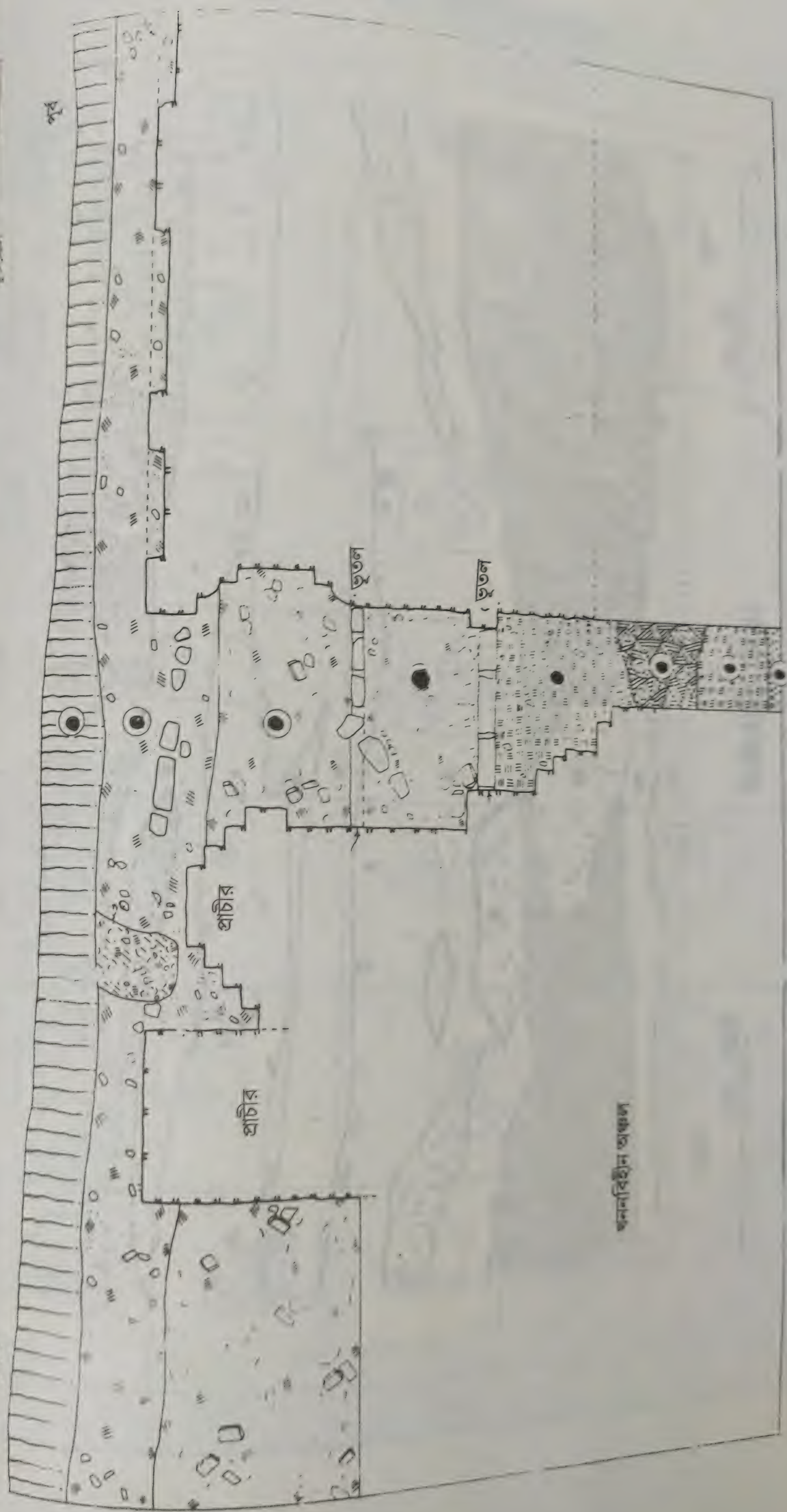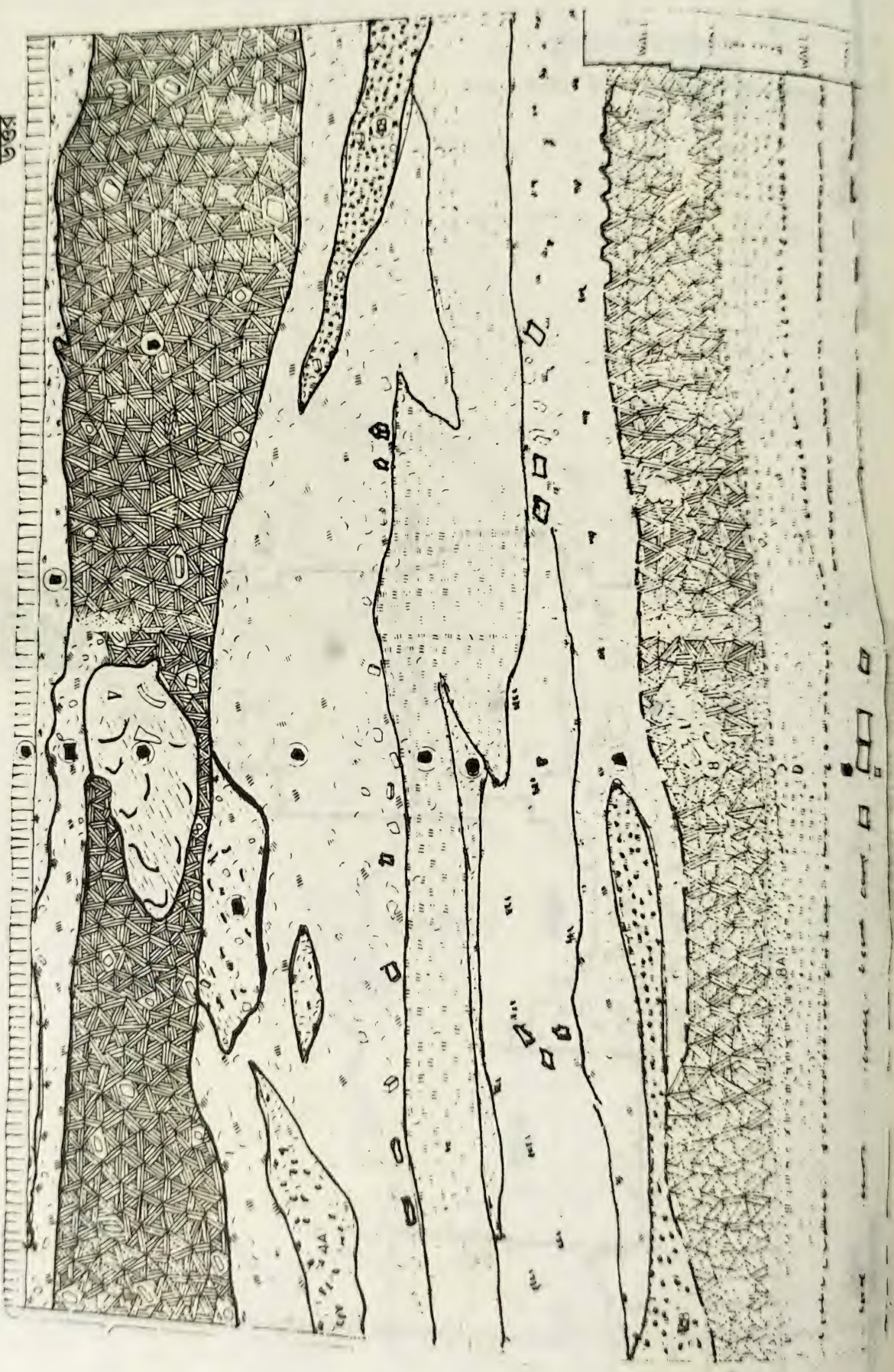
মিটার
পশ্চিম
পূর্ব
প্রাচীর
প্রাচীর
ভূতল
ভূতল
খননবিহীন অঞ্চল

রাজবাড়ী ডাঙ্গা

ফরাক্কাতে প্রাপ্ত রূপার ছাপযুক্ত মুদ্রা
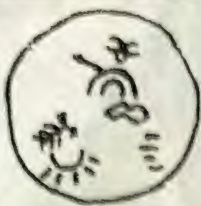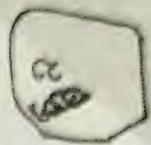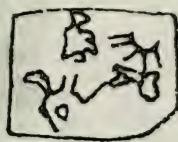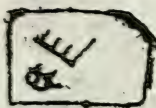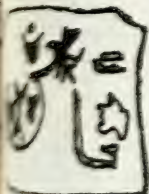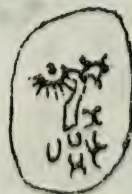
গরুড় স্তম্ভ　　　　কৈবর্তরাজের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ
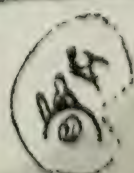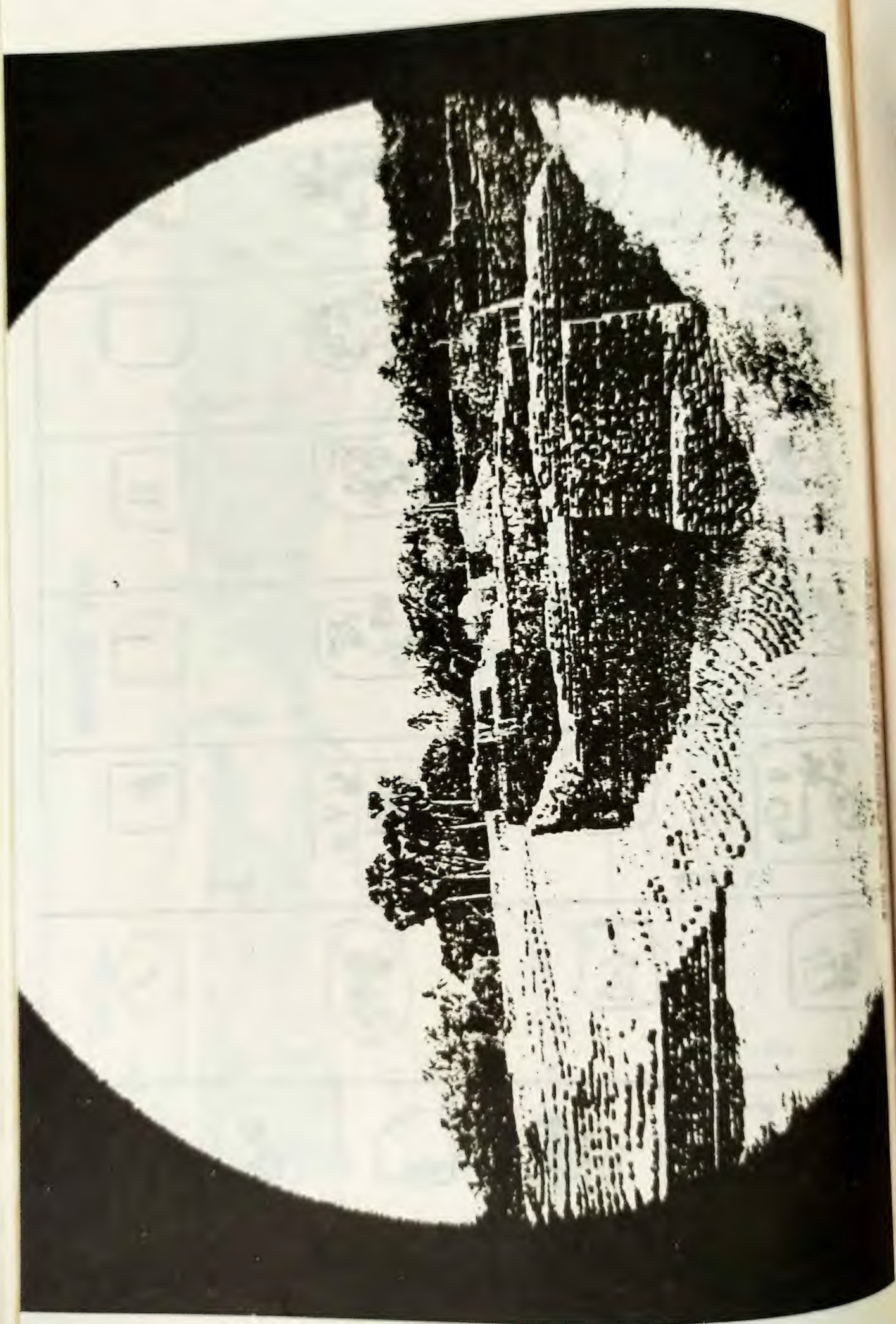
বাণগড় খনন ক্ষেত্রের পাঁচটি স্তর

ঝুড়ি আকৃতির মৃত্তিকা গহ্বর
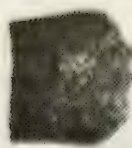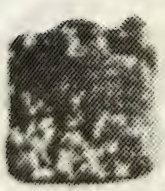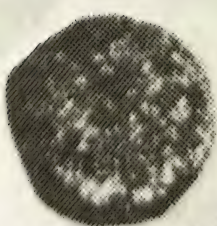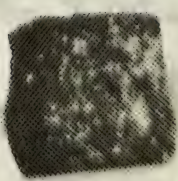
ছাপ যুক্ত ও ঢালাই করা মুদ্রা
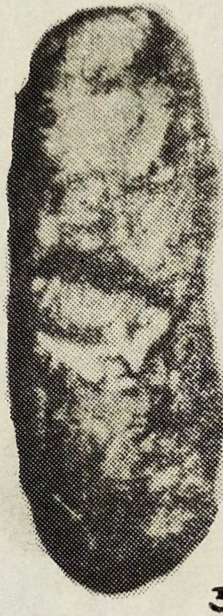
১,৩,৫ মাটির খোদাইকরা সীল
২,৪,৬ খোদাইকরা সোনার কবচ।

বাণগড়ে প্রাপ্ত কারুকার্য যুক্ত ইট

মালদার জগজ্জীবনপুরের উৎখনন ক্ষেত্র

মহাস্থানে প্রাপ্ত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী লেখ।